বিপ্লবী বাংলা

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র

ষষ্ঠ বর্ষ	শনিবার ৪ঠা জুন ১৯৭৭ ২১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪	৩৫ সংখ্যা

এই সংখ্যায়

—: বিষয় সূচী :—

জনতা সরকার কোন স্বার্থের বাহক ?	॥ সম্পাদকীয়
বাংলাদেশ উনসত্তর থেকে পঁচাত্তর ॥	॥ শ্রীমিহির কর্মকার
স্বভাষবাদ—সমাজতন্ত্রের নতুন তত্ত্ব ॥	॥ শ্রীজ্ঞান হালদার
বিপ্লববাদীদের সংগঠন ॥	॥ স্বর্গীয় ডাঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত
কি ধরণের সরকার উপযুক্ত ?	॥ শ্রীদিলীপ কুমার ঘোষ
জনতার নেতৃত্বে অশুভ ছায়াপাত ॥	॥ শ্রীঅরুণ ঘোষ
রাজনৈতিক পেন্সন মঞ্জুরীর তালিকা—	

বিপ্লবী বাংলা

বর্ষ- ৬
সংখ্যা- ৩৫, ৩৮
বর্ষ- ৭
সংখ্যা- ২৪, ৪১-৪৩
বিশেষ-সংখ্যা
১৩৮৪- ১৩৮৫
(1977) (1978)

বিশেষ অধিকার এবং একচেটিয়া অধিকার আমি ঘৃণা করি। জনসাধারণের সঙ্গে যাহা ভাগ করিয়া না লইতে পারি, তাহা আমার পক্ষে নিষিদ্ধ বস্তু।

—মহাত্মা গান্ধী

রাজনৈতিক পেন্সান মঞ্জুরীর তালিকা

জলপাইগুড়ি

শ্রীযমুনা প্রসাদ বেনিয়া	মোটালি বাজার		২০০	১৫, ৮, ৭২

২৪ পরগণা

শ্রীমণীন্দ্র নাথ বসু	রাইফেল রেঞ্জ রোড		২০০	৩১, ১২, ৭৪
,, জীবন হরি ব্যানার্জী	শ্যামনগর পোঃ		২০০	৪, ৪, ৭৪
,, দ্বিজেন্দ্র নাথ চৌধুরী	বিষ্ণুপুর রাজারহাট		২০০	২৯, ৩, ৭৪
,, সুনীল কুমার মুখার্জী	স্টেশন রোড গরিয়া		২০০	১, ৭, ৭৫
ডাঃ বিধু ভূষণ রায়	ইটনা কলোনী বাণিপুর		২০০	১৫, ৮, ৭২
শ্রীমতী প্রমিলা ভট্টাচার্য্য	(প্রয়াত রবীন্দ্র) রবীন্দ্র নগর: অ্যাভিনু সোদপুর		১০০	২৯, ৯, ৭৬

পেনসন বৃদ্ধি পেল—

শ্রীমণীন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত	৬৪৮ অশোক নগর	১৫০	২০০	১, ১০, ৭৬
,, উষা ভৌমিক	৪৮৩/৮ ,,	১৫০	২০০	,,
,, কালিপদ দাস	৫৮৫।১২ কল্যাণ গড়		২০০	১, ২, ৭৪
শ্রীমতী নিরোদা সুন্দরী রায়	(প্রয়াত সুরেন্দ্র) মিয়তন পল্লী খড়দহ		১০০	১৫, ৮, ৭২
রেণুকা রায়	(প্রয়াত বিধুভূষণ) ইটনা কলোনী বাণীপুর		২০০	২০, ৩, ৭৬
শ্রীসুরেন্দ্র কুমার চক্রবর্তী	দক্ষিণ কোদালিয়া নব ব্যারাকপুর		২০০	১৩, ৫, ৭৫
,, গৌরাঙ্গ সেনগুপ্ত	৫২ •দি, তালবাগান ব্যাঙ্ক কলোনী ব্যারাকপুর		২০০	৩১, ৫, ৭৫
শ্রীমতী মনোরমা গাঙ্গুলী	(প্রয়াত হরেন্দ্র কুমার)	টিটাগড়	১০০	৪, ৪, ৭৫
,, সন্তোষ বালা মণ্ডল	(প্রয়াত উপেন্দ্র) শহীদ ক্ষুদিরাম রোড বজবজ		১০০	১৬, ১, ৭৭
,, মাখন বালা রায়	(কৃপেন্দ্র নাথ রায়)	দক্ষিণ ছাবরা	১০০	২৯, ৫, ৭৬
,, সিতাংশু কুমার বসু	ওরফে পরেশ নাথ	বাটানগর	২০০	১, ৭, ৭৫

কলিকাতা

পেনসন বাড়ল

শ্রীশচীন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী	২।১২, শ্রীকলোনী (৪৭)	২০০	৩০০	৭, ১, ৭৭
শ্রীমতী বীণাপানি দত্ত	(প্রয়াত চিত্তরঞ্জন) ২৮।৭ নিউ বালিগঞ্জ (৩৯)		১০০	১, ১১, ৭৬

(এর পর ১৭ পাতায়)

সম্পাদকীয়

জনতা সরকার কোন স্বার্থের বাহক ?

ব্যাঙ্কে সুদের হার কমানো হচ্ছে। সেই সংগে কমছে যে সব ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ঋণ নিয়ে ব্যবসায়ে সেই টাকা আমানত করবে তাদের কাছ থেকেও সুদের হার কম নেওয়া হবে। অর্থাৎ জনতা সরকার জনতার বৃহত্তম অংশ নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্ষেত্রে তাঁরা যে টাকাটা ফিক্সড ডিপোজিট রাখবেন বা সেভিংস অ্যাকাউন্টে জমা রাখবেন তাদের বর্তমান সুদের হার কমিয়ে দেবেন আর যারা বিত্তশালী ব্যবসায়ী তারা ব্যাঙ্ক থেকে ধার নিয়ে যে টাকাটা তাদের ব্যবসায়ে খাটাবেন তাদের ক্ষেত্রে সুদের অংশটা কমিয়ে দিচ্ছেন। তাহলে এর মীটফলটা দাঁড়ালো কী ? জনতার বৃহত্তম অংশ নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী যাঁরা ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখবেন তাঁদের সুদের হার কমিয়ে দিয়ে বিত্তশালী ব্যাবসায়ীদের মুনাফা অর্জনের পথকেই প্রশস্ত করে দিচ্ছেন।

সংবাদে প্রকাশ ১জুন থেকে স্থায়ী আমানতের ক্ষেত্রে এবং আগামী ১লা জুলাই থেকে সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সুদের হার কমছে। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের শাখাগুলিকে সুদের হার কম করার ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে নির্দেশ পেয়ে সুদ কমানো হচ্ছে। সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সুদের হার শতকরা পাঁচ ভাগ থেকে কমিয়ে তিনভাগ করা হচ্ছে। স্থায়ী আমানতের ক্ষেত্রে ৯১ দিন থেকে সুরু করে ছয় মাসের কম সময়ের আমানতে সুদ সাড়ে পাঁচ শতাংশ থেকে কমিয়ে শতকরা চারভাগ করা হচ্ছে। ছয় মাস থেকে শুরু করে নয় মাসের কম পর্যন্ত সময়ের আমানতের সুদ ৬ ভাগ থেকে কমে দাড়ে চার ভাগ, ৯ মাস থেকে শুরু করে ১২ মাসের কম সময়ের আমানতের সুদ সাত ভাগ থেকে কমিয়ে পাঁচ ভাগ ১২ মাস থেকে সুরুকরে ৩৬ মাসের কম সময়ের আমানতের জন্য ৮ ভাগ থেকে কমিয়ে ৬ ভাগ, এবং ৩৬ মাসের ওপর থেকে ৬০ মাস পর্যন্ত স্থায়ী আমানতের ক্ষেত্রে সুদের হার শতকরা ৯ ভাগ থেকে কমিয়ে আট ভাগ করা হয়েছে।

এদিকে আর একটি সংবাদে দেখা যাচ্ছে দেশের অগ্রগণ্য ১২টি শিল্পগোষ্ঠী চিনির পত্রের দাম আর বাড়তে না দিয়ে ছয় মাসের জন্য স্থিতিশীল রাখবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যে বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সেখানে শিল্পগোষ্ঠী মালিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিড়লা, টাটা, দিল্লীর শ্রীরাম গোষ্ঠি. সিংহানিয়া. মফতলাল, কিংলস্কর, থ্যাকারসে. মাহিন্দ্র. আহমেদাবাদের কস্তুর ভাই লালভাই গোষ্ঠি, মাদ্রাজের অরুণাচলম গোষ্ঠি, ও ইমপিরিয়াল কেমিক্যাল ইনডাসট্রীজ প্রমুখ প্রধান প্রধান শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ।

অতীতের অভিজ্ঞতার আলোয় আমরা এই শিক্ষাই অর্জন করেছি ব্যাবসায়ীরা সরকারের সংগে ভদ্রলোকের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েও বার বার সে চুক্তিকে ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে নিক্ষেপ করে। সুতরাং শিল্প গোষ্ঠির ওই সিদ্ধান্তে কতটুকু আন্তরিকতা আছে—সে বিষয়ে এ দেশের জনতার মনে সংশয়ের যথেষ্ট অবকাশ আছে। কেননা আর একটি সংবাদে দেখাযাচ্ছে—দুদিন আগে বাজারে চিনির দর ছিল চারটাকা প্রতিকিলো সেটা গত মঙ্গলবার থেকে বেড়ে হয়েছে ৪ টাকা ৪০ থেকে ৪ টাকা ৫০ পয়সা। কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকই ১লা জুন থেকে খোলা বাজারে প্রতি কুইন্টাল চিনির দর ২১০ বাড়িয়ে ২৭৫ টাকা করে দিয়েছেন।

অথচ উত্তর প্রদেশে এ বছর আখের ফলন খুব ভাল। তা সত্ত্বেও চিনির দর বাড়ছে কেন ? আরও যে দর বাড়বে না সে গ্যারান্টি কিন্তু ব্যাবসায়ী মহলও দিতে পারছে না।

শিল্পমালিক গোষ্ঠী বাজার দরকে স্থিতিশীল রাখার প্রতিশ্রুতি দিলেও সরকারী সূত্র বলছে গত জানুয়ারীর তুলনায় ডাল. মশলার দরও বেড়ে গিয়েছে।

গরীব ছোট ছোট দোকানদার নিম্নমধ্যবিত্ত কর্মচারীর কষ্টের উপার্যনের টাকা খরচ বাঁচিয়ে সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্টে বা স্বল্প মেয়াদী জমা রাখতে ভবিষ্যতের জন্য কিছু লাভ হবে মনে করে জনতা সরকার তাদের উপরই প্রথম আঘাত হানলেন—সুদের হার ৫ টাকা থেকে কমিয়ে ৩ টাকা নির্দ্ধারণ_তবে অন্যদিকে বড় বড় ব্যাবসায়ীদের লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণের সুদের হার_কমিয়ে দিয়ে মোটা মুনাফার সুযোগ করে দিলেন—। কাদের স্বার্থ রক্ষায় এই জনতা সরকার ?

বাংলাদেশ

উনসত্তর থেকে পঁচাত্তর

। মিতির কর্মকার ।

সামরিক কর্তৃপক্ষ প্রথমে সার্জেন্ট জহুরুল হকের লাশ হস্তান্তরে রাজী হয়নি। জনতার চাপে পরদিন ১৭ই ফেব্রুয়ারী তার লাশ ছাত্র-জনতার হাতে সমর্পন করতে বাধ্য হয়। সেই লাশ নিয়ে স্বল্পকালের মধ্যে মিছিল ঢাকার রাজপথ প্রদক্ষিণ করে। মিছিল যখন আবদুল গনি রোডে পৌঁছে, তখন ঐ রোডের ১৫ নম্বর বাড়ী থেকে মিছিলের উপর গুলি বর্ষণ করা হয়। বাড়ীটি মোনেমের মন্ত্রী সুলতান আহমেদের।

শোক মিছিলের উপর অতর্কিত এই হামলায় ছাত্র জনতা হতচকিত হয়ে যায়। যে মিছিলের অগ্রভাগে রয়েছে লাশ, সেই মিছিলে মন্ত্রীর বাড়ী থেকে গুলির নিদর্শন এই প্রথম।

ক্ষুব্ধ জনতার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে যায়। সহস্র জনতা ঝাঁপিয়ে পড়ে মন্ত্রীর প্রহরীদের উপর। প্রাচীর ভেদ করে জনস্রোত মন্ত্রী নিবাসের ভিতরে এসে ধাক্কা মারে। ভেঙে তছনছ করে দেয়া হয় মন্ত্রীর সাধের আসবাবপত্র।

তারপর আগুন।

দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে প্রাসাদতুল্য মন্ত্রীর ভবন। উৎপাদিত জনতা জয়োল্লাসে ফেটে পড়ে।

ছুটে আসে দমকল।

জনতা দমকলের গাড়ীর সামনে রাস্তার উপর শুয়ে পড়ে। গাড়ী যেতে দেয়া হবে না। আগুন নেভানো চলবে না। জন বিরোধীদের শাস্তি জনতা দেবেই দেবে।

এরপর জনতার উত্তাল স্রোত আগরতলা মামলার বিচারক ট্রাইবুনালের চীফ জাষ্টিস এস, এ, রহমানের বাড়ীর সামনে এসে জড় হয়।

তাজা পেট্রোল দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয় বিচারপতির শান্তির নীড়। জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যায় বিচারক রহমানের যথা সর্বস্ব।

এরপর আগুন জ্বলে ধাক্কা খাসান আসকারীর ইমারতে। মুসলিম লীগের প্রধান পাণ্ডা আসকারী সাহেব বহু সম্পদ অর্জন করেছিলেন নানা উপায়ে। আগুনের হুতাশ সিথা সব পুড়িয়ে ছাই করে দিলো।

ভয়ে কেঁপে উঠেন সভর্ণর মোনেম খাঁ। প্রতিদিন জেলাগুলো থেকে আগুন, হত্যা, খুন প্রভৃতির খবর আসতে থাকে।

খবর আসে রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জনপ্রিয় অধ্যাপক ডঃ শামসুজ্জোহা গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন। মিছিলের উপর বেপরোয়া গুলি চালিয়ে আহত করেছে আরো অনেককে।

দেশের সর্বত্র এ সময় মিছিল, গুলি, হত্যা ও ধর্মঘট নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়।

সরকারী প্রশাসন একেবারে ভেঙে পড়ে। এ অবস্থায় বিদেশী সাংবাদিকেরা মন্তব্য করেন—জনাব মোফাখেম আহমেদ ঢাকার মুকুটহীন সম্রাট। তার কথায় গাড়ীর চাকা ঘোরে, বন্ধ হয়। অফিস-আদালত-ব্যাংক-স্কুল-কলেজ সবই তার কথা মত চলে।

বিপেহারা এই অবস্থায় প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান সকল রাজনৈতিক নেতাদের আমন্ত্রন জানালেন গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে। তিনি বললেন, আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সকল সমস্যার সমাধান করা হবে।

সম্মিলিত বিরোধী দলীয় মোরচা Democratic ction Committee (DAC)-এর আহ্বায়ক নবাবজাদা নসরুল্লাহ্ খান দায়িত্ব পেলেন অংশ গ্রহণকারীদের তালিকা প্রস্তুতের।

পাকিস্তানের রাজনীতিতে নবাবজাদা, পীরজাদা, শাহাজাদা ও সাহেবজাদাদের ভূমিকা আগাগোড়াই চমকপ্রদ। এরা সাধারণতঃ অভিজাততন্ত্রে বিশ্বাসী। আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে এদের অংশগ্রহণের মূল উদ্দেশ্য আইয়ুবের একচেটিয়া ক্ষমতায় ভাগ গ্রহণ করা।

প্রথম প্রথম নসরুল্লাহর ভূমিকা জনতার স্বার্থসম্মত মনে হলেও পরবর্তীকালে তার আসল চরিত্র প্রকাশ পেয়ে যায়।

গোল টেবিল বৈঠকে কে কে অংশ নেবেন, তার তালিকা প্রস্তুতের দায়িত্ব পেলেন নসরুল্লাহ খান। গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটির নেতা হিসেবে তিনি তালিকা প্রস্তুতের জন্য ঢাকায় এলেন।

তালিকায় শেখ মুজিবের নাম সুপারিশ করা হোল না। নসরুল্লাহর সাফ কথা—মুজিব দেশদ্রোহিতার অভিযোগে কারারুদ্ধ। সুতরাং আওয়ামী লীগের তরফ থেকে অন্য কেউ বৈঠকে যোগ দিক।

জনগণের পক্ষ থেকে দাবী উঠলো। মুজিবকে সম্মানজনকভাবে আমন্ত্রণ না জানালে, পূর্বাঞ্চলের কাউকে বৈঠকে যোগ দিতে দেয়া হবে না।

এরপর রাওয়ালপিণ্ডি থেকে জরুরী প্রস্তাব আসে, মুজিবকে বৈঠকে যোগ দেয়ার জন্য প্যারোলে মুক্তি দেয়া হবে। বৈঠক শেষে তাকে আবার পূর্বস্থানে অর্থাৎ কারাগারে যেতে হবে।

অসম্ভব।— সমস্বরে ছাত্রসমাজ গর্জে উঠে। প্যারোলে নয়, পরিপূর্ণ মুক্তি চাই।

কারাগারের মধ্যে পুরুষ সিংহ মুজিব সরকারী প্রতিনিধিকে জানালেন, শর্ত নিয়ে রাজনীতি করা আমার চরিত্রে নেই। প্যারোলে মুক্তির প্রস্তাব আমি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করি। গোল টেবিল বৈঠকে আমি অংশ নিতে পারি তখন যখন দেখবো আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে এবং সকল বন্দীদের বিনাশর্তে মুক্তি দেয়া হয়েছে।

আইয়ুব খান এবার অন্য চাল চাললেন। মুজিবকে রাজী করাবার জন্য 'ইত্তেফাক' সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন ওরফে মানিক মিয়া ও মুজিবের মামলার কৌঁসুলী জনাব সালাম খানকে নিয়োগ করলেন তিনি।

মুজিব মানিক মিয়াকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। বড়ভাইয়ের মতো ভক্তি করতেন। মানিকমিয়ার আত্মবিশ্বাস ছিলো তিনি মুজিবকে প্যারোলে মুক্তির ব্যাপারে রাজী করাতে সক্ষম হবেন।

মানিকমিয়া ও সালাম খান দু'জনে মুজিবের সাথে দেখা করলেন এবং প্যারোলে মুক্তির ব্যাপারে রাজী করাবার চেষ্টা করলেন। তারা নানা যুক্তি দিয়ে বোঝালেন, এই মুহূর্তে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেয়া একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং আইয়ুবের প্রস্তাবে মেনে নেয়া ভালো।

মুজিব শান্তভাবে সাংবাদিক মানিকমিয়া ও এ্যাডভোকেট সালাম খানের কোরালো যুক্তিগুলো শ্রবণ করলেন। তারপর অত্যন্ত স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দিলেন, পরাজিত সৈনিকের মতো প্যারোলে মুক্তি নিয়ে গোলটেবিল বৈঠকে আমি যোগ দিতে পারি না। যেতে হয় আপনারা যান।

এরপর মানিকমিয়া ও সালাম খান বেগম মুজিবকে ধরেন। বেগম মুজিবকে তারা অনুরোধ করেন বঙ্গবন্ধুকে প্যারোলে মুক্তির ব্যাপারে রাজী করাতে। তাদের দৃঢ়বিশ্বাস বেগম সাহেবা মুজিবকে অনুরোধ করলেই মুজিব রাজী হবেন।

দীর্ঘক্ষণ উকিল ও নামকরা সাংবাদিকের লম্বা চওড়া বক্তৃতা শুনে বেগম সাহেবা এবার মুখ খুললেন, আপনারা যা আশা করেছেন, তা হবার নয়। আমার স্বামী প্যারোলে মুক্তি নিক্, তা আমি চাই না। আমি তাকে কখনো অন্যায় অনুরোধ করিনি, ভবিষ্যতেও করতে পারবো না।

২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯।

(বাকি অংশ ১৫ পাতায়)

কি ধরণের সরকার উপযুক্ত ?

॥ দিলীপ কুমার ঘোষ ॥

আমি যদি অনেকের সামনে হঠাৎ বলে বসি যে ভারতের মতো দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক এবং যতদিন অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত থাকবে বা নীতিবান না হবে ততদিন এ ব্যাপারে সাফল্য লাভের আশা খুব বেশী নেই তাহলে হয়তো চারপাশ থেকে প্রতিবাদের ঝড় উঠবে সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন উঠবে যে কিরকম শাসনব্যবস্থা এদেশে উপযুক্ত আমার উত্তরের অনেক সমালোচনা হবে, ফাঁক ফোকরও অনেক বেরুবে এবং শেষ পর্যন্ত হয়তো দু'একজন বাস্তববাদী ছাড়া আমার উত্তরের যথার্থতা সবাই না-ও বুঝতে পারেন। তবুও বলবো গণতন্ত্র একটি শক্ত সুরেলা বাঁশী, দম না থাকলে ও বাজাতে না জানলে তার সুরের মিষ্টতা শোনা যায় না, তবে ভারতের মতো দেশে গণতন্ত্রের সাফল্যের কথা হাস্যকরই নয় ব্যঙ্গ রসাত্মকও বটে তা যেন স্কুলের ছোট ছেলেমেয়েদের নিজেদের মধ্যে শান্তভাবে সলেশ ভাগ করে নিতে বলার সামিল।

ভারতের মতো বিরাট দেশে যেখানে অধিকাংশ লোকের চরিত্রে নীতির একান্ত অভাব সেখানে Benevolent Dictator Ship ই বোধহয় সবথেকে উপযুক্ত শাসনব্যবস্থা যদি সেই ডিক্টেটর বুদ্ধিমান, মাত্রাজ্ঞানী, বাস্তববাদী নির্লোভ ও চরিত্রবান হন।

দ্বিতীয় রকম শাসনব্যবস্থা হচ্ছে দু তিনজন প্রবীণ Umpire বা রেফারীর অধীনে একটা দল শাসন করবে। Umpire রা হবেন দেশের লোকের ভোটে নির্বাচিত নীতিবান এবং নির্লোভী, স্বার্থহীন প্রবীণ ব্যক্তি যাদের কথা উক্ত দলের সকলে মানতে বাধ্য থাকবে।

তৃতীয় রকম শাসনব্যবস্থা হবে নৈতিক চরিত্রের ওপর ভিত্তি করে। যারা ভবিষ্যতে দেশশাসন করতে চান তাদের Indian Military Academy র মতো নৈতিক চরিত্র গঠনের কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে পাঁচ, ছয় কি দশ বৎসর শক্ত ট্রেনিং নিতে হবে। তারা I. A. S. দের মতো দেশের রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, ধর্মীয়, সমাজ ও সংস্কৃতি এবং আইন এ সকল বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান অর্জন করবেন। সবার চেয়ে বড়ো কথা তাদের নীতিশিক্ষা দেওয়া হবে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে ও কঠোর ভাবে। যখন বোঝাযাবে যে তাদের, নীতিবোধ কংক্রীটের মতো শক্ত হয়েছে তখনই ঐ প্রতিষ্ঠান সার্টিফিকেট দেবে এবং ঐ ব্যক্তি দেশের শাসনব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করার উপযুক্ত বিবেচিত হবে।

আর একরকম শাসনব্যবস্থার কথা ভাবা যেতে পারে-সেটা হচ্ছে যিনি ভারতের রাষ্ট্রপতি হবেন তিনি অতি গোপনে পাঁচ থেকে দশজন চরিত্রবান, দেশশাসনে অভিজ্ঞ লোককে মনোনীত করবেন যাদের নামঠিকানা রাষ্ট্রপতি ছাড়া কাকপক্ষীও জানবে না। তাঁরা গোপনে দূর থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শাসক-গোষ্ঠীর কার্যকলাপ লক্ষ্য রাখবেন মন্ত্রী বা শাসকদের কার্য্য কলাপ ভুলপথে চললে রাষ্ট্রপতি মারফত গোপনে উক্ত শাসকদের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত ভাবে সতর্ক করে দেওয়া হবে এবং শাসকদের কারুর বা অনেকের বা সকলের মধ্যে গর্হিত দুর্নীতি বা শাসনকার্য্যে মারাত্মক ভুল বা অন্য কোন ত্রুটি দেখলে রাষ্ট্রপতি মারফত পদচ্যুত করতে বা শাস্তি দিতে পারবেন তাতে শাসকগণ সবসময়ে ভয়ে ভয়ে থেকে ঠিক পথে চলতে চেষ্টা করবেন এবং উক্ত নীতিবান গোয়েন্দাচক্রের নাম-ধাম না জানায় সুপারিশের জোরে কেউ বেঁচে যেতে পারবেন না। কোন মন্ত্রী বা শাসকদলের কার্যাবলী পর্য্যালোচনার জন্য মধ্যে মধ্যে তাঁরা গোপনে মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।

নেহাত যারা সংসদ ও গণতন্ত্র না দেখলে মূর্চ্ছা যেতে পারেন তাদের জন্য একটা মাঝামাঝি রফা করা যেতে পারে আর তা হচ্ছে প্রত্যেক মন্ত্রীকে প্রতি একবছর ছাড়া নিজ এলাকার বাসিন্দাদের কাছে গোপন ভোটে তাঁর কার্য্য কলাপ তাঁরা কেমন ভাবে নিচ্ছে তা যাচাই করে নেওয়া। যদি দেখা যায় অধিকাংশ ভোটদাতা তাঁর কার্য্যকলাপে সন্তুষ্ট নয় তবে তাঁকে পদত্যাগ করতে হবে। এটা হচ্ছে Reterrendum বা Recall এরই নামান্তর মাত্র।

সবচেয়ে ভাল শাসনব্যবস্থা হতে পারে প্রাচীন গ্রীসের মতো oligarchy বা অভিজাততন্ত্র যাঁচের যেখানে দেশের শ্রেষ্ঠ গণ্যমান্য অভিজাতরা দেশশাসন করতেন। প্রথাটা একটু পালটে নেওয়া যেতে পারে যেমন ধরুন, রাষ্ট্রপতি প্রথমে একটি অভিজ্ঞ নিরপেক্ষ পরামর্শদাতা বোর্ড গঠন করবেন। এরা ভারতের সব রাজ্যের সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয়, নির্লোভ চরিত্রবান, এবং নিরপেক্ষে শাসনকার্য্যে অভিজ্ঞ লোকেদের একটি তালিকা প্রস্তুত করবেন। প্রত্যেক রাজ্যে ব্যালট পেপারে ঐ রাজ্যের ১০, ১৫ কি ২০ জন স্থানীয় গুণী লোকদের মধ্যে অন্তত পাঁচজনকে নির্ব্বাচিত করতে বলা হবে। এভাবে একশত নির্ব্বাচিতের মধ্যে ৭৫ / ৮০ জনকে মন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী করা হবে। বাকী ২০।২৫ জনের তালিকায় নাম থাকবে। ঐ ৭৫ / ৮০ জনের মধ্যে কেউ মারা গেলে বা পদত্যাগ করলে রাষ্ট্রপতি বা দলনেতা প্যানেল থেকে শূন্যস্থান পূরণ করবেন। যদি উক্ত মন্ত্রীরা বিভিন্ন মতাদর্শের লোক তবুও ভারতের স্বার্থে অনুযায়ী দলপতি বা রাষ্ট্রপতি একটা সাধারণ কর্ম্মসূচী ঠিক করে দেবেন এবং ঐ কর্ম্মসূচীর ভিত্তিতেই কাজ চলবে যার ওপর রাষ্ট্রপতির কড়া নজর থাকবে অথবা জনমতের অধিকাংশের চিঠির মাধ্যমে কোন মন্ত্রীর বিরুদ্ধতা করলে তাকে পদত্যাগ করতে হবে।

সত্যিকথা বলিতে কি, ভারতের মতো গরীব দেশে লোক সভা রাজ্যসভা, বিধান সভা বা পরিষদ এসব পুষে কোটি কোটি টাকা শ্রাদ্ধের বোধহয় খুব বেশী প্রয়োজনীয়তা নেই। আপনি

বলবেন তাহলে জননেতা যাচাই হবে কি ভাবে ? আমার উত্তর যে কোন বিতর্কিত বিষয় জনসাধারণ নির্ভয়ে সংবাদপত্রে যেভাবে চিঠিপত্র দেন তা দেখেন তার জন্য আলাদা বিভাগ থাকবে এবং তার গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে, অধিকাংশের মত-ই হবে মন্ত্রীদের কাজ ও নীতি-নির্ধারণের Guide lines.

বস্তুত: ইংলণ্ড আমেরিকার গণতন্ত্র অনেকাংশে সফল হয়েছে বলে ভারতের মতো দরিদ্র দেশে দীর্ঘদিন তা নিয়ে পরীক্ষা-নীরিক্ষা চালিয়ে জনসাধারণের চূড়ান্ত দুর্ভোগ আনার কোনই অর্থ হয় না । প্রচুর অর্থ, সময় ও যাগ যিতণ্ডা নষ্ট করে ঐ ব্যবস্থা সফল হবার কোন সম্ভাবনা নেই বলে দীর্ঘদিন পরে তা সজলনেত্রে ডাষ্টবিনে ছুড়ে ফেলে দিলে তা ষাট কোটি লোকের পক্ষে Mass Sucide এরই নামান্তর হবে মাত্র ।

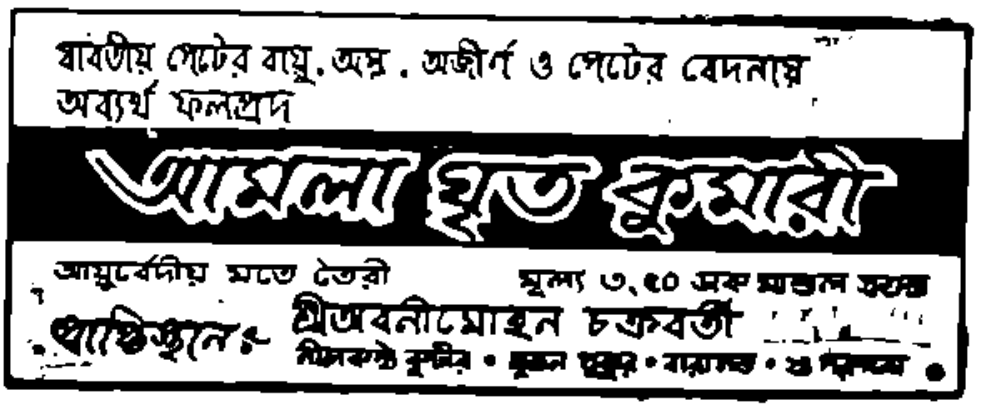

জনতা নেতৃত্বে অশুভ ছায়াপাত

। শ্রীঅরুণ দেব ।

ভারত বর্ষের রাজনৈতিক জগতে স্বর্গত মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধীকে মাহাত্মে প্রতিষ্ঠা করেছে বাঙ্গালী কবির অভিজ্ঞান পত্র, জাতির জনকের গৌরবময় পদে প্রমোশন দিয়েছে ভারত-আত্মার মূর্ত প্রতিক নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের অভিজ্ঞান পত্র। সচরাচর অভিজ্ঞান পত্র দিবার অধিকার থাকে কার ? — যিনি শ্রেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞান পত্র দেন আচার্য্য, উপাচার্য্যগণ। গান্ধীজীর মাহাত্ম্য ও জাতির জনকত্ব ওরফে 'বাপুজীত্ব' লাভ ঘটেছিল ভারত আত্মার শ্রেষ্ঠ সাধক বাঙালী জাতির ত্যাগ ও বৈরাগ্যের মহিমায়। প্রত্যুত্তরে গান্ধীজী চালিত জাতীয় কংগ্রেস থেকে বাঙ্গালী জাতি পেয়েছে চরম বিশ্বাস-ঘাতকতা, চরম অবজ্ঞা। বাঙালী জাতির নিজস্ব ভূ-সম্পত্তি, শিক্ষা, সংস্কৃতিকে ভেঙ্গে চুরে টুক্‌রো টুক্‌রো করে দিতে এই জাতীয় কংগ্রেসকে দেখা গিয়েছিল সাম্রাজ্য বাদী বৃটিশ প্রভুদের প্রধান সহায়করূপ। জাতীয় কংগ্রেসের বহু প্রতিশ্রুত আশ্বাস ছিল স্বাধীনতা লাভের পর বাঙ্গালার খণ্ডিত অঞ্চলগুলি বা বিহার উড়িষ্যা, আসামে বৃটিশ ভূখণ্ডভুক্তি চরিতার্থ করবার জন্য যুক্ত করা হয়েছিল তা প্রত্যার্পণ করা হবে। ঐতিহাসিক ঘটনা হল কংগ্রেস রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যে পশ্চাৎ দ্বার দিয়ে সেই ইংরাজ প্রভুদের সাথে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে বাঙ্গলা আরও খণ্ডিত করে এবং সেই সঙ্গে বাঙ্গালীর বিপ্লবী মালী পাল্লাবকেও বজ্রাঘাতে দুই টুক্‌রো করে। জাতীয় কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতির পদ থেকে সুভাষ চন্দ্রকে বিতাড়ন পর্বে গান্ধী নেতৃত্বের যতটা দৃঢ়তা দেখা গিয়েছিল বাঙ্গালাকে পুনঃ খণ্ডিত করার সময়ে গান্ধী নেতৃত্বে ততটাই দুর্বলতা দেখা গিয়েছিল। চাচা ফজলুল হক, শরৎচন্দ্র বসু, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ বাঙ্গালাকে মুসলীম্ লীগের কবল থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য কৃষক প্রজাপার্টির সাথে কংগ্রেসের কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে চেয়েছিলেন ; কিন্তু পরম আশ্চর্য্যের বিষয় সেদিন বৃটিশ সম্রাটের পরম বন্ধু গান্ধী মহাত্মা বাঙ্গালীকে কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে দিলেন না। বলা বাহুল্য সেই কোয়ালিশন সরকার বাঙ্গালীদের সবচাইতে জনপ্রিয় সরকার ছিল এবং সাম্প্রদায়িক দুষ্ট চক্রান্ত একেবারে মড়ি-ঘরে (Mory-house) আশ্রয় নিয়েছিল। তাই যদি হ'ত তবে ইংরাজ প্রভুদের মতলব মত বাঙ্গালায় পাকিস্তান সৃষ্টি করা সম্ভব হ'ত না ; কিন্তু কেন হল ? কারণ জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বিজাতীয় প্রভুদের অনেক বহু নকল দেশপ্রেমিক সেজে জেলটেল খেটে নৈকষ্য কৌলীন্য লাভ করেছিল এবং তাদের সাথে ইংরাজদের গোপনে পাকিস্তান পরিকল্পনার চূড়ান্ত অনুমোদন প্রকাশ্য ইতিহাসের আড়ালে অপ্রকাশ্য ইতিহাসে করে নেওয়া হয়েছিল। তাদের হাতে জনতা তুলে দেওয়ার ঠিক পূর্বমুহূর্তে এই সব ইংরাজ বন্ধুদের গোপন তালিকা বৃটিশ ভারতীয় বুদ্ধিমান বিভাগ গভীর

যাতে আগুনে পুড়িয়ে নষ্ট করে দেয়। তার খান কয়েক কপি অবশ্য বৃটিশরাজের খাস দপ্তরে আজও সুসংরক্ষিত আছে বলে শোনাযায়। আরও শোনা যায় জনৈক বিদ্রোহী ভারতীয়র কাছে সেই গোপন তালিকার একটি নকল নাকি কি ভাবে পাচার হয়ে যায় ভারত বিভাগের কয়েক দিনের মধ্যেই। যাক্ সে পরের কথা!

প্রকাশ্য ইতিহাস বলে গান্ধীজী দেশ বিভাগ চান নাই। তাঁর ঐতিহাসিক উক্তি—"আমার মৃতদেহের উপর দিয়ে যেন দেশ বিভক্ত হয়—কিন্তু তাঁর জীবন্ত দেহের উপর দিয়েই দেশ বিভক্ত করলেন তাঁর ভক্তকুল। তখন গান্ধীজীর যেন একটু মোহ নিদ্রা ভঙ্গ যোগ ঘটেছিল—তিনি বলেছিলেন, "আজ সুভাষ দেশে থাকলে দেশ বিভাগ কিছুতেই হতে পারতো না।" তিনিই বলেছিলেন—"আমার অন্তরের বাণী বলেছে যে সুভাষ মারা যায় নাই—সে যে কাজের জন্য এসেছে তা সম্পন্ন না করে তার মৃত্যু নাই!" তিনি আরও বলেছিলেন—"সুভাষ আমারও নেতা, নেতাজী!" অথচ কি আশ্চর্য্য যে গান্ধী বাদীরা নেতাজীকে জাতীয় নেতা হিসাবে গন্য করে না এবং বিগত তিরিশ বছরে জনতা দখল করে দিনের পর দিন নেতাজীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, অপপ্রচার, চরিত্র হনন, জনমানসে মিথ্যা ধারণা সৃষ্টির প্রয়াস প্রভৃতি নানা কূট কৌশলে চালিয়ে এসেছে। ফলে গান্ধীবাদীদের প্রতি সারা ভারতের সাধারণ মানুষদের একটা অবিশ্বাসের ভাব দানা বেঁধেছে।

জনতা সরকার ত্রিশ বছরের বৃটিশ কায়েমী স্বার্থের গোলাম ও তল্পিবাহকদের ক্ষমতাচ্যুত করে খণ্ডিত, অভিশপ্ত ভারতের ইতিহাসে নূতন মোড় পরিবর্তন করেছে। জানিনা গান্ধীজীর সমাধি ঘাটে শপথ গ্রহণ কারী নেতারা গান্ধীজীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে নেতাজী সুভাষ চন্দ্রকে জাতির মুক্তি দাতা অবিসংবাদিত নেতাজীরূপে বরণ করবেন কিনা। এই খানেই জনতা সরকারের দেশপ্রেম কতটা খাঁটি অথবা কতটা মেকী তার চূড়ান্ত পরীক্ষা হয়ে যাবে এবং এই জনতা সরকারের পরমায়ু গননা সহজতর হয়ে যাবে। কারণ ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে যে জনতা দলে সম্মীলিত শক্তিগুলির মধ্যে দেশপ্রেম অপেক্ষা স্বার্থপরতাই মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। নির্বাচনী আসন বন্টনে দলীয় চক্রান্ত প্রবল ভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। লোকসভা নির্বাচনে সি, এফ, ডি'র প্রচণ্ড-নৈতিক শক্তির সাহায্যে জনতা দলের সাফল্য একটি অনস্বীকার্য্য ঐতিহাসিক ঘটনা। অথচ তাকে বিধান সভা নির্বাচনে চূড়ান্তভাবে অবজ্ঞা করা হয়েছে। ফলে জনতার পক্ষে তপশিলী ও মুসলীম ভোটের সংখ্যা যথেষ্ট হ্রাস পাবে বলে আশঙ্কা করা যাচ্ছে। তারপর নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই জনতাদলে ভাঙ্গন ধরা অসম্ভব নয়।

তাছাড়া জনতা সরকারের কয়েকটি দুর্বলতা ইতিমধ্যেই লোকচোখে ধরা পড়েছে। তারমধ্যে প্রথম কথা হল নিত্যপ্রয়োজনীয়ও খাদ্য দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিরোধে অক্ষমতা এবং সেই চিরাচরিত মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের নিকট গান্ধীপন্থার আবেদন নিবেদন—যা বিগত তিরিশ বছরে এমন কি জরুরী অবস্থা মুকাবেলাও অসার, অন্তসার শূন্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্রমশঃ সন্দেহ দেখা দিচ্ছে যে, কংগ্রেস যেমন নির্বাচনী তহবিল সংগ্রহের জন্য ব্যবসায়ীদের যথেচ্ছ মূল্যবৃদ্ধির গোপন মৌখিক লাইসেন্স দিত জনতার দলের ভিতরও সেই রকম জনতার শত্রু দুর্নীতিপরায়ণ কিছু ব্যক্তির অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

তৃতীয়তঃ আর একটি সন্দেহের কারণ প্রধান মন্ত্রী বারংবার পুঁজিপতি ও শিল্পপতিদের দরিদ্র জনসাধারণের অছিরূপে বর্ণনা করে তাদের উপর আস্থা পোষণ করেছেন ; অর্থাৎ জনতাদলও নির্বাচনে পুঁজিপতিদের করুণা ও কৃপাভিক্ষার্থী। তাঁরা শিল্পপতিদের ভয় করে চলেছেন। গান্ধীবাদীদের উক্ত বিশেষ শ্রেণীর উপর যুক্তিহীন দুর্বলতাই স্বাধীনোত্তর কালে ভারতের মুদ্রাস্ফীতি ও অর্থ নৈতিক বিপর্যয়ের প্রধান কারণ। যুদ্ধ বিধ্বস্ত জার্মান ও জাপানের অর্থ নৈতিক অবস্থা আমাদের চাইতে হাজারগুণ বিপর্যস্ত ছিল। তারাও বৈদেশিক ঋণ সংগ্রহ করে জাতির পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেছিল আমাদের পরে। অথচ আজ তারা জাতিকে ঋণ মুক্ত তো করেছেই, উপরন্তু তারা বিশ্বে আজ মহাজনের ভূমিকায় অবতীর্ণ! বিশ্ব অর্থনীতিতে পঃ জার্মানের ডয়েসমার্ক এবং জাপানের ইয়েন দৃঢ় ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত! জনসাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যক পণ্য মূল্য প্রাক্ যুদ্ধকালীন স্বাভাবিক পর্যায়ে তারা নামিয়ে এনেছে। অথচ ভারতের চিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত। তেইশ শত কোটী ষ্টার্লিং ব্যাঙ্ক ব্যালান্স নিয়ে কংগ্রেস ইংরাজের জমিদারী ইজারা নেয়। যুদ্ধের বিধ্বংসী আবহাওয়া থেকে ভারত মুক্ত ছিল, আজ ভারতের মানুষের দেশার দায় চুল বিক্রী হয়েগেছে। এর প্রত্যক্ষ প্রমান অসাধু চরিত্রহীন, দেশপ্রেম বর্জিত নেতৃত্ব! অথচ এই আত্মস্বার্থকারী নেতৃত্বকে ইতিহাসের পাতায় ক্ষমতার জোরে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। যাদের কোর্টমার্শালে বেয়নেটের খোঁচায় সমাধিস্থ করার কথা তাদের চরিত্রকে দেবতার মহিমায় মণ্ডিত করে জনসাধারণের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে! গান্ধীজীর হত্যা রহস্য থেকে বহু নেতার রহস্য জনক মৃত্যু সম্বন্ধে সত্যকে গলাটিপে মেরে ফেলা হয়েছে। প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রীর ক্যাপসুল রহস্যভেদে জনতা সরকারের অনিচ্ছা জনমনে প্রচণ্ড সন্দেহের আঘাত ইতিমধ্যেই দেগেছে। অথচ ঐ ক্যাপসুল রহস্য নির্বাচনের আগেই ভেদ করলে জনতা সরকারের জনপ্রিয়তা প্রচণ্ড তুঙ্গে উঠে যেত এবং মানুষের আস্থা ব্যাপক ভাবেই লাভ করা যেত।

চতুর্থতঃ মারুতি কেলেঙ্কারী তদন্ত চলাকালীন কি ভাবে পাহাড় প্রমাণ জাল-জুয়াচুরির কাগজ পত্র কারখানার মধ্যেই পুড়িয়ে ফেলতে দেওয়া হল অথবা সঞ্জয় গান্ধীকে এভাবে প্রশ্রয় দেওয়া হল—তা এক বিরাট প্রশ্নের আকার নিয়েছে। কোন একটি বিশিষ্ট সাপ্তাহিকে সংবাদ প্রকাশ হয়েছিল যে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ সঞ্জয়কে গ্রেপ্তার করতে চেয়েছিল অথচ তাদের জনতা সরকার আজও সেই অনুমতি দেন নাই কেন? —এটাও এক বিশেষ ধোঁকার সৃষ্টি করেছে।

পঞ্চমতঃ পাবলিক একাউন্টস্ কমিটির রিপোর্টে ভূরি ভূরি জঘন্য জাতীয় অপরাধে প্রমাণিত

অপরাধী প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রীকে বড় বেশি দয়া দাক্ষিণ্য দেখানো হচ্ছে, যা সমস্ত ভারতের জনমনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। এইখানে জনতা সরকার জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা ব্যক্তিগত বদান্যতাকে প্রাধান্য দিচ্ছেন বলে অনায়াসে ধরে নেওয়া যায়।

ষষ্ঠতঃ আমরা আশা করেছিলাম কংগ্রেস দল ও সরকার বিগত তিরিশ বছর ধরে নেতাজীর বিরুদ্ধে যে ঠাণ্ডালড়াই চালিয়ে গিয়েছে তার অবিলম্বে সমাপ্তি ঘোষণা করা হবে জনতা ক্যাবিনেট অবিলম্বে একটি শ্বেত পত্র ঘোষণা করবেন; কিন্তু সন্দেহের কারণ দেখা দিয়েছে যে জনতা সরকার নেতাজী বিষয়ে কংগ্রেসের ষড়যন্ত্র মূলক নীতির কোন পরিবর্তন করতে ইচ্ছুক নন বলে বিশ্বস্ত সূত্রে শোনা যাচ্ছে। জনতা সরকারের মুখ্যমান যদি কোথাও লুকিয়ে থাকে তবে তা এইখানেই। কারণ ভারতবর্ষে যাঁরা খাঁটি দেশপ্রেমিক আছেন এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের গুপ্ত রহস্য সম্পর্কে হস্তান্তরকারী বৃটিশ জাতির প্রকৃত মনোভাব অবগত আছেন তাঁরা নিঃসন্দেহে স্বীকার করেন যে, ভারত পাক-বাংলাদেশ যে ধরণের স্বাধীনতাই পেয়ে থাকুক না কেন, তা নেতাজীর জন্যই পেয়েছে তারা। স্যার উইনস্টন চার্চিল স্পষ্টই বলেছিলেন যে বৃটিশ সাম্রাজ্য লিকুইডেশনে দিবার জন্য তিনি প্রধান মন্ত্রীগিরি করতে দশ নম্বর ডাউনিং ষ্ট্রীটে বসেন নি; অর্থাৎ ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটনের মতই ভারতবর্ষের একমাত্র মুক্তি দাতা হিসাবে নেতাজী সুভাষ চন্দ্রকেই বোঝায়, অন্য কোন দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ঐ খানে ক্ষমতা প্রয়োগে কালিকলমের সাহায্যে বসানো যায় না এবং যাবে ও না! ভ্রান্ত ইতিহাসকে একদিন ধুলো মিশে যেতে হবেই তবে!! তাই জনতা নেতৃত্বে যে অশুভ ছায়াপাতের লক্ষণ দেখা দিচ্ছে তাঁদের মঙ্গলের জন্যই সময় থাকতে সত্যপথ অবলম্বন করতে উপদেশ দেওয়া সাংবাদিকদের নৈতিক কর্তব্য হিসাবে এই সমীক্ষার অবতারণা। অলম্ বিস্তারেণ! বন্দেমাতরম্।

শাস্ত্রে অসাধারণ বুৎপত্তি সম্পন্ন—বিখ্যাত 'ফলিতজ্যোতিষ' গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীহরিহর জ্যোতিশাস্ত্রী

বি, এ, এল, এল. বি (কলি) এ, সি, আই, আই (লণ্ডন)

প্রতিদিন সকাল ৮টা হইতে ১১টা এবং মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার ব্যতীত অন্যদিন বৈকাল ৫টা হতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত ঠিকানায় সর্ব্বপ্রকার জ্যোতিষী কার্য্য করেন।

কোষ্ঠী বিচারের পারিশ্রমিক ন্যূনপক্ষে ২০ টাকা।

চেম্বারের ঠিকানা :— সি-৩৪ কাঞ্চনগো পার্ক, গড়িয়া, ২৪ পরগণা।
৪ নং বাসরুট, বৈকুণ্ঠবাটা ষ্টপ।

বিপ্লববাদীদের সংগঠন

এই রচনাটি স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ সহোদর স্বর্গীয় বিপ্লবী ডাঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্তের ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম পুস্তক হইতে পুনর্লিখিত। —সম্পাদকমণ্ডলী

কোন প্রকারের ছেলে বৈপ্লবিক দলে আসতো? — এ প্রশ্নের জবাব সহজে দেওয়া যায়না। যাঁরা "ভারতের মঙ্গলের জন্য স্বাধীনতা প্রয়োজন" এই মতবাদ গ্রহণ করতেন ও তার জন্য কিছু করতে প্রস্তুত তাঁরাই বৈপ্লবিক দলভুক্ত হতেন। অবশ্য আগে তাঁদের চরিত্র সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে খোঁজ খবর নিয়েই তবে তাঁদের দলভুক্ত করা হত। এদের ভেতর কেউ কেউ হুজুগে মেতে আসতো আবার পরে দল ছেড়ে পালিয়েও যেতো। তবে এ ধরণের যুবকের সংখ্যা কম ছিল। যুবকদের কিছুদিন ধরে পরীক্ষা করে দলভুক্ত করা হত। আবার এমন ধরণের লোকও দলে এসে জুটেছিল যারা সুবিধাবাদী চরিত্রের লোক। সামাজিক সুবিধার জন্য দলভুক্ত হত। সাধারণতঃ এ ধরণের লোক আসতো নবীন উকীল, ডাক্তার ও শিক্ষক শ্রেণী থেকেই। তাদের এ সব কাজে Intellectual appreciation ছিল। দশজন লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে তাদের উৎসাহ ছিল, স্বদেশী আন্দোলনের সময় হুজুগের কাজে "গরম দলের" চাই হত, কিন্তু স্বার্থত্যাগ কিম্বা সাহস বা আত্মত্যাগের প্রয়োজন হলে তারা পিছু হটে যেত। এরা ভারতীয় স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী রাজনৈতিক মতবাদী সেইজন্য এদের বিপ্লববাদী বলা যেতে পারে, কিন্তু এদের বিপ্লবী বলা যায় না।

বিপ্লব মতবাদে বিশ্বাসী আর বিপ্লবীদের মধ্যে পার্থক্যটা হোল এই বিপ্লব মতবাদে বিশ্বাসীরা মতবাদের খাতিরে হয়ত কিছু পয়সা দিতে পারেন বা দু একজন লোককে এই মতে আনবার চেষ্টা করেন অথবা পেছনে থেকে অন্তভাবে সাহায্য করতে পারেন কিন্তু প্রকৃত বৈপ্লবিক কাজে তাঁরা সাহস দেখাতে পারেন না। কিন্তু যিনি বৈপ্লবিক কাজে নিজেকে আত্মোৎসর্গ করেন এবং এই আদর্শের জন্য প্রতিপলে জীবনকে বিপন্ন করতে দ্বিধা করেন না, তাঁকেই বলা যায় প্রকৃত বিপ্লবী। এই ধরণের চরিত্রের ব্যক্তি সবাই হতে পারেন না।

ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদের মত এই যে, এক প্রকার চরিত্রের মানসিকতা সচরাচর লোকের হয়না, এবং মস্তিষ্কের অস্বাভাবিক (Pathologized) অবস্থা না হলে বৈপ্লবিক কাজেও লিপ্ত হওয়া যায়না। তন্মধ্যে সকলেই Propaganda of act (বাস্তব বৈপ্লবিক প্রচার) যেমন—বোমা ছোঁড়া, অত্যাচারীকে খতম করা, বাড়ী পুল ব্যাঙ্ক উড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি করতে পারেন না। বাংলায় বিপ্লবীদের অনেকেই Propaganda of act এর রাস্তাতেই গিয়েছিলেন। সচরাচর যাঁরা বৈপ্লবিক দলে আসতেন তাঁরা উচ্চ আদর্শের ও সৎ চরিত্রের লোক। প্রচলিত রাজনীতির দ্বারা ভারতের মঙ্গল হবে না তারই জন্য চাই স্বাধীনতা এবং সেই স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করা উচিত এবং তার জন্য জীবন উৎসর্গ করব এই সঙ্কল্প নিয়েই সেদিনের তরুণ ও যুবকেরা বৈপ্লবিক দলভুক্ত হত। এঁদের মধ্যে যাঁরা কিশোর বা নব্য যুবক তাঁরা ভাবপ্রবণ বলেই কাজে উৎসাহ, সাহস ও স্বার্থত্যাগ করতে পারতেন। বিশ্বের বৈপ্লবিক আন্দোলনের ইতিহাসে দেখা যায়, যাঁরা কিশোর ও উঠতি যুবক তাঁরাই বৈপ্লবিক কাজে সাহস দেখায়। ভারতে বা বাঙলায় তার ব্যতিক্রম হয়নি।

এখন প্রশ্ন হল বিশ্বের বিপ্লববাদের ইতিহাসে ভারতীয় বিপ্লববাদের স্থান কোথায়? ভারতীয় বিপ্লববাদ বাংলায় বিশেষভাবে প্রকট হয়েছিল কিন্তু বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলনকে সমগ্র ভারতীয় আন্দোলন থেকে পৃথক করা যায় না। বাংলার গুপ্ত সমিতি স্থাপনের সঙ্কল্প দক্ষিণাপথ থেকে আমদানী। তার রীতিনীতি এবং পদ্ধতিও তৎপ্রদেশ অনুযায়ী। অর্থাভাবে রাজনৈতিক ডাকাতি করাও কি তাঁতিয়া তাদের অনুকরণ নয়? কেউ কেউ হয়তো বলবেন এই পদ্ধতিটী আনন্দমঠ থেকে গৃহীত, কেউ বলবেন এটা অর্থাভাবের স্বতঃসিদ্ধ-প্রণালী, কোনটা সত্য? রাজনৈতিক হত্যাও কি চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের কাজের অনুকরণ নয়? তবে বাংলায় সর্বপ্রথম বোমার আবির্ভাব হয়েছিল। বাংলার বিশেষত্ব এই যে, ভারতীয় বিপ্লববাদে যে বীজ নিহিত ছিল সেইটাই বাংলায় প্রস্ফুটিত হয়।

ভারতীয় বিপ্লববাদের লক্ষণগুলি বিশ্বের বিভিন্ন বৈপ্লবিক আন্দোলনগুলির মাঝে পাওয়া যায়। যদি প্রথম থেকে দেখি তাহলে দেখা যায় ফরাসী বিপ্লবই এ যুগের বিপ্লব আন্দোলনের প্রথম ইতিহাস। এর সঙ্গে অবশ্য বৈপ্লবিক আন্দোলনের তুলনা করা যায় না। এর পরে ইতালির কারবোনারির দল (Carbonary) এঁদের লক্ষণগুলি হল গুপ্তসমিতি গঠন, গুপ্ত হত্যা, কিন্তু নির্দিষ্ট আদর্শ অনুপস্থিত। ভারতীয়দের বৈপ্লবিক লক্ষ্য এঁদের সঙ্গে কিছুটা মেলে কিন্তু সবটা নয়। তারপর আসে রাশিয়ার Decembrist দের দল, যারা আশী বছর আগে সে দেশে বৈপ্লবিক আন্দোলন আরম্ভ করেছিল। বিখ্যাত-কথ লেখক Dostoisky এর অন্যতম। এই আন্দোলন সে দেশে ছাত্র ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবি দলের (intellectual) দ্বারা সংগঠিত হয়েছিল। এরা ছিলেন বিশেষ অবস্থাপন্ন শ্রেণীর লোক।

এর পরেই আসে রাশিয়ার সমাজ-বৈপ্লবিক দল (Social Revolutioneries) এদের কোন নির্দিষ্ট (Concrete) প্রোগ্রাম ছিল না। ১) এরা শুধু হত্যা করত। বিদেশে যাঁরা কথ বিপ্লবীদের বোমা ছোঁড়া ও রাজনৈতিক হত্যার কথা শুনেছেন সেটা ওই সমাজ বৈপ্লবিক দলের এবং আনার্কিষ্ট দলের দ্বারাই সংঘটিত হত। এঁরাই কথায় কথায় বোমা ছুঁড়তেন। এঁদের আত্মত্যাগের ইতিহাস বিশ্বে অতুলনীয়। রুষ বিপ্লবের প্রথমাবস্থায় এঁরাই ছিলেন কর্ণধার। কেরেনেস্কি এই দলেরই লোক ছিলেন। এঁরা নিজেদের কৃষক শ্রেণীর মঙ্গলাকাঙ্খী বলেই নিজেদের পরিচয় দিতেন। এঁদের সাহসিকতা ও অত্যাচারী রাজকর্মচারীদের খতম করার ব্যাপারে ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখা যায়—বিশেষতঃ বাংলার 'বোমা' এঁদের কাছ থেকেই নকল করা। এর পরেই রুশ দেশে বলশেভিক দলের আবির্ভাব। সবশেষে ন্যাশন্যালিজম এর বড় প্রবক্তা ম্যাটসিনির দলের কথা উল্লেখ করা যায়। ম্যাটসিনির দল গুপ্তহত্যায় লিপ্ত থাকতো, কিন্তু ম্যাটসিনি নিজে কার্লমার্ক্সের প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও তাঁর একটা সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক (Socio-economic) প্রোগ্রাম ছিল। তিনি যে ভাবে ছাত্রদের মধ্যে কাজ করতেন তেমনি শ্রমজীবিদের মাঝেও কাজ করতেন। আমরা ম্যাটসিনির 'ন্যাশন্যালিজম' যে সংবাদ রাখি, কিন্তু খবর রাখিনা যে ম্যাটসিনি আন্তর্জাতিক ছিলেন, তাঁর জাতীয়তাবাদে শ্রেষ্ঠ বিভাগ ছিলনা। তাঁর সামাজিক অর্থ নৈতিক দর্শনশাস্ত্র (Socio-economic Philosophy) কার্লমার্ক্সের মত থেকে পৃথক হলেও তাঁর 'জাতীয়তাবাদ' ইউরোপীয় ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ থেকে ভিন্ন। এর পরেই আসে বিশ্ববিখ্যাত অ্যানার্কিষ্ট দলের কথা। ইংরেজ সরকার ভারতীয় বিপ্লবীদের বিশ্বের সমক্ষে হেয় করার জন্য তাঁদের অ্যানার্কিষ্ট বা টেররিষ্ট আখ্যা দিত। এটা ভারতীয় বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে এক নির্লজ্জ কপটাচার ছাড়া কিছু নয়। অ্যানার্কিজম এক রাজনৈতিক সমাজনৈতিক আদর্শ।

এই ভাবে বিপ্লববাদের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ভারতীয় বিপ্লববাদ অন্য দেশের বিপ্লববাদের সঙ্গে মেলেনা। ভারতীয় বিপ্লববাদ অনেক বিষয়ে কাঁচা ছিল কিন্তু ব্যক্তিগত সাহস ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তে ভারতীয় বিপ্লবীরা বিশ্বের বিপ্লবীদের চেয়ে পিছিয়ে ছিল না।

১৯০২ সন ১৯১৮ সন পর্যন্ত এই পর্যায়ের পর্য্যালোচনা করতে দেখা যায় ভারতীয় বিপ্লবীরা একদিকে যেমন বিপ্লববাদের প্রচার করেছেন—বোমা প্রস্তুত করেছেন আবার তেমনি বিদেশী সৈনিক শ্রেণীতে প্রবেশ করেছেন—গোরেন্দার বিপক্ষে গোয়েন্দাগিরি করেছেন। নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে অত্যাচারীকে খতম করেছেন—লাঠির বদলে লাঠি চালিয়েছেন—গুলির বিরুদ্ধে গুলি চালিয়েছেন—বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানীর চেষ্টা করেছেন—দেশীয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিপ্লবাগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করার জন্য সুদেহ কানাডার নিকট কাস্তারার মরুভূমিতে শত্রুর গুলি উপেক্ষা করেও বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা দেখিয়েছেন। বিপ্লবীদের কাজ যবনিকার অন্তরালে বা লোক চক্ষুর অগোচরে থাকতো তাই তাদের ইতিহাস থাকতো অপ্রকাশিত।

'সুভাষবাদ—সমাজতন্ত্রের নতুন তত্ত্ব'

॥ শ্রীজ্ঞান হালদার ॥

শ্রেণী সংগ্রামের বিবেকানন্দ সুভাষচন্দ্রের ব্যাখ্যা

(পূর্বানুবৃত্তি)

তারপরের পরিচ্ছেদে সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে বিবেকানন্দের মন্তব্য অনেকের কাছেই জটিল মনে হতে পারে, কাজেই কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। বিবেকানন্দ এখানে সমাজতন্ত্র বলতে ইউরোপে তৎকালে প্রচলিত সমাজতান্ত্রিক ধারণাগুলির সাধারণ রূপেরই সমালোচনা করেছেন। বস্তুতঃ এই সমালোচনা সমন্বয়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকেই উদ্ভূত। ঐ পঙ্‌ক্তিগুলির আগে পরে পড়লেই ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে। সমাজতন্ত্রের চিন্তাধারার মধ্যেই সমন্বয়ের ভারতীয় মৌলিক সম্মিলনই তিনি দেখিয়েছিলেন, এবং তারই বিকশিত রূপ আমরা খুঁজে পাই নেতাজীর চিন্তাধারার মধ্যে। এর পরে বিবেকানন্দের আর দুটি উদ্ধৃতি তুলে দেবার এখানে প্রয়োজন রয়েছে।

"এমন সামাজিক অবস্থা কিছু চিরস্থায়ী হতে পারেনা। এ কথা সত্য যে, কলকারখানা দ্রব্যাদি সুলভ করেছে, বৈষয়িক উন্নতি ঘটিয়েছে, কিন্তু কেউ ধনী হবার জন্য লক্ষ লক্ষ লোককে নিষ্পেষিত করবে দরিদ্রেরা আরও দরিদ্র হবে, দলে দলে মানুষ ক্রীতদাসে পরিণত হবে—এ জিনিস চলতে পারেনা, স্বার্থপরতা ও অহমিকাপূর্ণ বর্তমান ধনিক সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য।"

(জনগণের অধিকার পৃঃ —৮)

"ভেবেছিলাম আমেরিকা শ্রমিক সমস্যার সমাধান করবে। ভেবেছিলাম, সেখানে মানুষের অধিকার সাম্য রয়েছে। কিন্তু সে বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ধনীদের স্বার্থপরতা, বিশেষাধিকার রক্ষার হাস্যকর চেষ্টা, একনায়কতা, আমেরিকাকে গ্রাস করেছে। পাশ্চাত্য সমাজ নরক বলে মনে হচ্ছে।

ভাবী অভ্যুত্থান ঘটবে রাশিয়ায় অথবা চীনে, বলতে পারিনা ঠিক কোথায়।

আমাদের শ্রমিক সমস্যার সমাধান আমাদেরই করতে হবে। কিন্তু কী ভয়ঙ্কর সংঘর্ষের, কী ভীষণ আলোড়নের মধ্যে দিয়ে তা ঘটবে। জাতি বর্ণ একাকার হয়ে যাবে।"

সবচেয়ে শেষের উদ্ধৃতিটি বিশেষভাবে লক্ষনীয়। এই সংক্ষিপ্ত কয়েকটি লাইনের মধ্যে থেকে আমরা চারটি খুব গুরুত্বপূর্ণ সংকেত পাচ্ছি। প্রথমতঃ বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে দিয়ে শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, বিত্তহীন জনসাধারণ বিকাশের সমস্ত সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়, নৈতিক ভাবেই সমগ্র ব্যবস্থার চাই আমূল পরিবর্তন। দ্বিতীয়তঃ চীন আর রাশিয়া সম্পর্কে তাঁর অসাধারণ ভবিষ্যদ্বাণী। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য কার্লমার্ক্সের রাশিয়া বা চীন সম্পর্কে ধারণা সম্পূর্ণ অন্য রকম ছিল। মার্ক্স এর ধারণা ছিল শ্রমিক বিপ্লব আসবে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স বা জার্মানীর মত শিল্পোন্নত দেশে। কিন্তু বাস্তব ঘটনা ঠিক তার উল্টো হ'ল। রাশিয়া এবং চীনের মত দুটি পশ্চাদ্‌পদ এবং আধা সামন্ততান্ত্রিক দেশেই বিপ্লব হ'ল। অবশ্য চীনের ক্ষেত্রে মার্ক্স এর মূল তত্ত্বকেই তার অন্য ধরণে কৃষক শ্রেণীকে বিপ্লবের অগ্রগামী করে বস্তুতঃ মার্ক্সের চিন্তা ধারার সঙ্গে মূলগত ভাবেই পার্থক্য তৈরী করতে হ'ল। এখন প্রশ্ন বিবেকানন্দ রাশিয়া বা চীনকে ভাবী অভ্যুত্থানের ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করে ছিলেন কেন? তাঁর বক্তব্য কোন বিচারহীন প্রলাপ নয়, এর পিছনে কাজ করেছিল তাঁর অসাধারণ দূরদৃষ্টি এবং বাস্তব বোধ। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে তা পড়ে না, এর সঙ্গে আরো একটা জিনিস ছিল যা আমাদের আলোচনায় প্রাসঙ্গিক, তা হল কৃষকশ্রেণীর বিপ্লবী ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁর চেতনা।

তৃতীয়তঃ যেটা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তা'হল তিনি দেখিয়েছেন যে আমাদের দেশের শ্রমিক সমস্যার সমাধান আমাদের করতে হবে সম্পূর্ণ নিজস্ব পদ্ধতিতে। অধিকন্তু উল্লেখ করা যায় ১৯৩১ সালের ৪ঠা জুলাইয়ে সারা

(বাকি অংশ ১৬ পাতায়)

(৪ পাতার শেষাংশ)

সেই যাহারো থেকে শুরু হয়েছে, আজো চলছে অব্যাহত নির্মম গতিতে। শাসক চক্র, সাম্প্রদায়িক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বারবার শহীদের বেদীকে কলুষিত করার চেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু তারা সফল হয়নি। তারা বলেছে, শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ নিবেদন, নগ্নপদে শোভাযাত্রা, প্রাক্‌প্রভাতে আল্পনা আঁকা, সর্বোপরি শহীদদের জন্য মিনার তৈরী করা ইসলামী মতে অনুচিত ও গর্হিত কাজ। তাই ডঃ রাশান রাহমান, মওলানা ফরিদ আহমেদ, ডঃ কাজী দীন মোহাম্মদ, অধ্যাপক গোলাম আজম, নাট্যকার আশকার ইবনে শাইখ, অধ্যাপক মোহর আলী প্রমুখ পণ্ডিত ব্যক্তি কখনো শহীদ মিনারে যান নি পুষ্পস্তবক হাতে নিয়ে। তারা বলেছেন, ঐ পদ্ধতি অনৈসলামিক, ঐ পদ্ধতি হিন্দুয়ানী। হিন্দুরা সরস্বতী পূজো, দুর্গাপূজো প্রভৃতিতে যেভাবে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করেন, একুশের শহীদ মিনারেও সেভাবেই নিবেদিত হয় শ্রদ্ধাঞ্জলী। এ কথা দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশের একমাত্র সিলেট জেলাতেই বারবার শহীদ মিনার কলুষিত হয়েছে। এমন কি ১৯৭২ সনে মুজিব শাসনামলেও জামাত পন্থীরা শহীদ মিনার ভেঙেছে।

বাংলার যুবক যুবতীদের কাছে একুশে কেবলমাত্র শুধু শোক দিবস নয়। পবিত্র দিবসও বটে। কালো পতাকা উত্তোলন, কালো ব্যাজ ধারণ, প্রভাত ফেরী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা ইত্যাদির মাঝেই দিনটির তাৎপর্য নিহিত নয়। এ দিন এক দিনে আসে নি। দীর্ঘদিনের প্রস্তুতির পর এ দিনের জন্ম হয়েছে।

সে অনেক পুরোপো কথা।

১৯৪৮ সাল।

পূর্ব বাংলার একমাত্র সরকার বিরোধী ছাত্র প্রতিষ্ঠান ছাত্র লীগের এক ইস্তেহার বের হোল ঢাকায়। তাতে লেখা—'বাংলা ভাষাকে শিক্ষার বাহন, রাষ্ট্রভাষা এবং আদালতের ভাষা বলিয়া ঘোষণা করিতে বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকার অস্পষ্ট ও সন্দেহজনক অভিমত প্রকাশ করিয়াছে। সরকারের উদাসীনতা এবং পরিচালনার অব্যবস্থার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংসের পথে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। রাষ্ট্র ভাষারূপে বাংলা যাহাতে স্থান না পায় সেইজন্য ভীষণ ষড়যন্ত্র চলিতেছে। নূতন নোট, ষ্ট্যাম্প, খাম, পোষ্টকার্ড, মণিঅর্ডার ফর্ম, মুদ্রা ও অন্যান্য জিনিস হইতে সমস্ত পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মুখের ভাষা বাংলাকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের নৌ-বাহিনীর পরীক্ষায় উর্দুতে ফেল হইবার ফলাফল পূর্ব বাংলার যুবকদের বাদ দেওয়া হইতেছে। ইংরাজীর পরিবর্তে উর্দুর জুলুম আমাদের ঘাড়ে চাপিয়া বসিতেছে, বিমান, নৌ ও স্থল বাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিকদের পুরোপুরি বাদ দেওয়া হইতেছে।'

ভাষাকে কেন্দ্র করে সে সময় ঢাকা ও করাচীতে তুমুল বৈ হুল্লোড় চলছে। পত্র পত্রিকায় প্রচুর লেখালেখি হচ্ছে। ঢাকায় মর্নিং নিউজ পত্রিকা উর্দুর পক্ষে।

শুধু পত্র পত্রিকাই নয়, দেশের নামকরা বুদ্ধিজীবিদের একটা বৃহত্তম অংশও উর্দুকেই গ্রহণযোগ্য ভাষা বলে মত প্রকাশ করলেন। সিলেট জেলার কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবি উর্দুকে পছন্দ করেই ক্ষান্ত রইলেন না। তারা রীতিমত একটা স্মারকলিপি তৈরী করে পূর্ববাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনের কাছে প্রেরণ করলেন। স্মারকলিপিতে বলা হোল যে, জনমতের প্রতিনিধিত্ব করার ভাব দেখিয়ে বাংলার মতো এমন এক ভাষার দাবী তারা তুলেছে, যে ভাষায় একটি মুসলিম রাষ্ট্রের জাতীয় ভাষার মর্যাদালাভের যোগ্যতা একেবারেই নেই। মুসলিম সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যবাহী উর্দুভাষাকে বর্জন করার এই নির্লজ্জ প্রচেষ্টা শুধু যে ধ্বংসাত্মক তাই নয়, তা পশ্চাদমুখী, নিন্দনীয় এবং সর্বোপরি ইসলামী ভ্রাতৃত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ-স্বরূপ।

স্মারকলিপিতে আরো বলা হয় যে, উর্দু সেই প্রেরণা-উদ্দীপক শক্তি, যা এই বিশাল উপমহাদেশের দশ কোটি মুসলমানকে একতাবদ্ধ রাখতে পারে। পবিত্র কোরাণ ও অন্যান্য ইসলামী সাহিত্য থেকে প্রেরণাপ্রাপ্ত উর্দু ভাষাকে অবহেলা করে আমরা যদি প্রধানতঃ রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ, বেদ ও অন্যান্য হিন্দু সাহিত্য থেকে প্রেরণা-

প্রাপ্ত বাংলাভাষার দিকে যাই, তাহলে আমরা জাতীয় সত্তাকেই হারাবো'।

মুসলমান চিন্তাবিদদের মনে সর্বদাই বাংলা-উর্দু বিরাজমান ছিল। দেশজ সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি বিমুখ হবার জন্য তারা সাধারণ মুসলমানদের পরামর্শ দান করতেন। কখনো কখনো ধর্মীয় আবরণ দিয়ে তাদেরকে বোঝাতেন যে, ইসলাম আরব থেকে এসেছে। সুতরাং যারা ইসলাম ধর্মাবলম্বী তাদেরকে আরবীয় সংস্কৃতির প্রতি অনুগত থাকতে হবে।

উর্দু আরবীর ভাষা নয়। আরবের ভাষা আরবী। তবু যেহেতু উর্দু ইসলামী ছাঁচে তৈরী, সেহেতু এটাই তাদের নিজস্ব ভাষা।

যে কথা বলছিলাম—ভাষা নিয়ে যখন পাকিস্তানের দু'অংশে তুমুল চৈ চৈ চলছে তখন অর্থাৎ ১৯৪৮'এর ২৩শে ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান গণ পরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে ভাষা প্রশ্নে তুমুল গণ্ডগোল হয়। পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসের মূল্যায়নে এই ঘটনার গুরুত্ব প্রচুর।

স্বাধীনতা-উত্তর পাকিস্তানে সরকারী দল মুসলিম লীগের একমাত্র বিরোধী সংগঠন জাতীয় কংগ্রেস। কংগ্রেসের নেতা, কর্মী, সমর্থক সবাই হিন্দু। আর মুসলিম লীগের নামই প্রমাণ করছে, তার নেতারা কোন্ ধর্মাবলম্বী।

গণ পরিষদের কংগ্রেস দলীয় নেতা বীরেন্দ্র নাথ দত্ত দুটি প্রস্তাব পেশ করেন। (১) বছরে অন্ততঃ একবার ঢাকায় পাকিস্তান গণ পরিষদের অধিবেশন বসতে হবে। (২) বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে হবে।

বীরেন্দ্র নাথ দত্তের প্রথম প্রস্তাবটি বিরোধিতা করেন জনাব তমিজউদ্দিন খান। দ্বিতীয় প্রস্তাব নিয়ে শুরু হয় তুমুল বাকবিতণ্ডা। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান বীরেন বাবুর ভাষাবিষয়ক প্রস্তাবকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে বলেন, প্রথমে এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নির্দোষ মনে করেছিলাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা এবং মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্ট করাই এই প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য।

(১৪ পাতার শেষাংশ)

ভারত ট্রেডইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে কলকাতায় দেওয়া তাঁর অভিভাষণের শেষ পরিচ্ছেদ। সমবয় প্রসঙ্গে বর্তমান প্রবন্ধের প্রথম কিস্তি বিপ্লবীবাংলা বর্ষ-৩, সংখ্যা-২৩, পৃঃ ৮এ উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য। স্থানাভাবে সেটি এখানে পুনরায় উদ্ধৃত করা গেল না। এই নিজস্ব পদ্ধতি সম্পর্কে নেতাজী অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে কি বলেছেন তা আমরা একটু পরেই দেখতে পাব।

(চলবে)

মহামান্য প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তৃতার পর পরিষদে মুসলমান নেতারা বীরেন দত্তের উপর খাপ্পা হয়ে উঠেন। নানা কটূক্তিও উচ্চারিত হয়।

কংগ্রেস দলের সেক্রেটারী রাজকুমার চক্রবর্তী জোরালো ভাষায় বীরেনবাবুর প্রস্তাব সমর্থন করেন। তিনি বলেন, পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বাংলায় কথা বলে। সুতরাং বাংলাকে সরকারী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া ন্যায় সঙ্গত।

এই সময় সরকার দলীয় একজন সদস্য বলে উঠেন, চক্রবর্তী মহাশয়ের জানা উচিৎ পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান, বাঙালী নয়।

মোহাজের ও পুনর্বাসন মন্ত্রী গজনফর আলী খান বীরেন দত্তকে আক্রমন করে বলেন—উর্দু মুসলিম সংস্কৃতির ভাষা। এই ভাষার বিরুদ্ধে কথা বলা মানেই মুসলমানের বিপক্ষে কথা বলা।

খাজা নাজিমউদ্দিন তার বক্তৃতায় বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানেরা উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে পেতে আগ্রহী। কিছু সংখ্যক হিন্দু অনুপ্রবেশকারী, ভারতের দালাল 'বাংলা বাংলা' করে চিৎকার করছে। কিন্তু তাদের জানা উচিৎ, এটা কখনো সম্ভব নয়। পাকিস্তান এসেছে মুসলিম রীতিনীতি মেনে চলার জন্য। হিন্দু পদ্ধতি, হিন্দু সংস্কৃতি মেনে চলতে নয়। [চলবে]

শ্রীমতী আভা ভট্টাচার্য্য (প্রয়াত সৌহান শেখর) নারায়ণ তলা (৫১)	২০০	১, ১০, ৭৫
,, নারায়ণী চন্দ (প্রয়াত রুহিদাস) ১।১১।৬০ সরষকবান রোড (০৭)	১৫০	৯, ৩, ৭৭

মালদহ

শ্রীমহম্মদ মণ্ডল	বালুপুর	২০০	১০, ১০, ৭৫
,, জগন্নাথ পোদ্দার	,,	,,	,,
,, লক্ষ্মীনারায়ণ পোদ্দার	,,	,,	,,
শ্রীনাথ পোদ্দার	,,	,,	,,

মেদিনীপুর

শ্রীভূপেন্দ্র মা প্রধান	গোপালপুর	২০০	২২. ১২, ৭৬
শ্রীমতী স্নেহবালা সাঁতরা (প্রয়াত বিহারীলাল)	আকন্দবাড়ী	২০০	১৫, ৮, ৭২
শ্রীশরদিন্দু সামন্ত	কুলবাড়ী	২০০	২২, ১২, ৭৬
,, যতোদা চরণ সিনহা	খরিতানগর	২০০	২২, ৩, ৭৪
শ্রীমতী নিশি রাণী পর্ণ (প্রয়াত মণিভূষণ)	বন্দবাড়ী	৩০০	৩, ৯, ৭৬

হাওড়া

শ্রীগণেশ চন্দ্র মিত্র ১৫, অমৃত পাইন লেন,	(১)	২০০	১, ৪, ৭৪
শ্রীমতি বেলা বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রয়াত হৃষিকেশ)	পোঃ খালনা	১০০	১৫, ৮, ৭২
,, সুষমা চক্রবর্ত্তী (প্রয়াত বিজয় কুমার)	পোঃ ডোমজুর	১০০	১২, ১২, ৭৬
শ্রীঅমিয় কুমার সিংহ ৫৫৩ সার্কুলার রোড,	শালাগাছি	২০০	১১, ৯, ৭৭
শ্রীমতি বিন্দিবাসিনী গিরি (প্রয়াত ভবতারণ)	সেন্ট ল ক্যাশনাল হার্বেরিয়ান বোটানিক গার্ডেন	২০০	১৫, ৮, ৭২
,, সমতাবালা সামন্ত (প্রয়াত সতীশ চন্দ্র) ১২ কার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত লেন কলিঃ		১০০	২৫, ১১, ৭৩

মেদিনীপুর

শ্রীচারু চন্দ্র বেরা	পোঃ বেজপুর	২০০	১৯, ৯, ৭৩
,, নগেন্দ্র নাথ বেরা	মাণিকপুর বন্দীগ্রাম	২০০	২, ৪, ৭৪
,, অদ্বৈত দাস অধিকারী	দক্ষিণ চক	২০০	৩, ৪, ৭৪
,, যতীন্দ্র নাথ মাইতি	তাজপুর	২০০	৩, ৩, ৭৪
,, রমণী মোহন মাইতি	পোঃ খাগদা	২০০	১৫, ৫, ৭২

(ক্রমশঃ)

Regd. No. R. N .24511/71 | Biplabi Bangla | Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা | ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা | প্রতি সংখ্যা—৩০ পয়সা

1 JUN 1977

— সম্পাদক মণ্ডলী —
শ্রীঅমরীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীপরিমল বসুমহাশয়, শ্রীপুলিন চ্যাটার্জী, শ্রীবাসীশ রায়।
সম্পাদক—শ্রীশান্তি শরণ রায়চৌধুরী ও যুগ্ম-সম্পাদক—শ্রীঅমল বসু।
প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত ।
বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৯৯ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭
মুদ্রণে :—প্রিন্টিং পাবলিসিটী, ১১৭ নং কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯

বিপ্লবী বাংলা

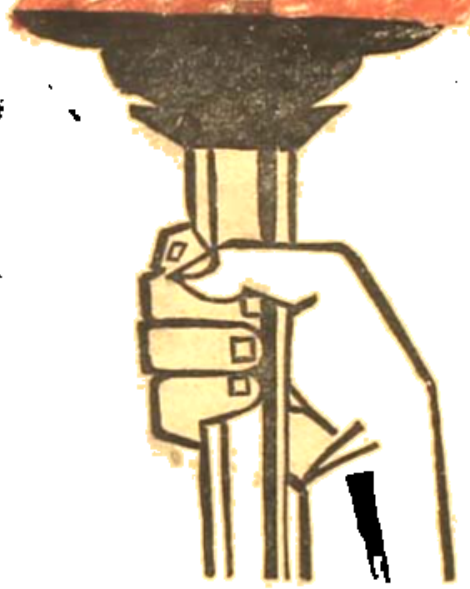

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র

ষষ্ঠ বর্ষ	শনিবার ২৫শে জুন ১৯৭৭ ১০ই আষাঢ়, ১৩৮৪	৫৮ সংখ্যা

এই সংখ্যায়

—: বিষয়সূচী :—

স্ব-স্বাগতম	। সম্পাদকীয়
বাংলাদেশ উন্নয়ন থেকে পশ্চাদ্ভব	। শ্রীমিহির কর্মকার
ট্রিপল এ্যাটাক—	। দিলীপ কুমার ঘোষ
বিপ্লবীদের চরিত্র—	। শ্রীপার্থ
শুভাষবাদ—সমাজতন্ত্রের নতুন তত্ত্ব ।	। শ্রীজ্ঞান হালদার
রাজনৈতিক পেশন মজুরীর তালিকা—	

সমস্ত ক্ষমতা চাই জনগণের হাতে।

—নেতাজী

রিষড়া সেবাসদন

রাসবিহারী-নেতাজী ওয়ার্ড নির্ম্মান প্রকল্প

কয়েকবছর পূর্বে, কয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের চিকিৎসার উদ্দেশ্যে বিপ্লবী নায়ক মহারাজ মৈত্রকুমার মাতৃর পুণ্য স্মৃতিতে উৎসর্গ করে দশ শয্যাবিশিষ্ট একটি পৃথক ওয়ার্ড রিষড়া সেবাসদনে স্থাপিত হয়। বলাবাহুল্য একটি শয্যাও একদিনের জন্য খালি পড়ে থাকে না। বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী রুগী এই ওয়ার্ডে চিকিৎসালাভ করেছেন এবং এখনও করছেন।

প্রয়োজনের তুলনায় এবং ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা মেটাতে দশটি শয্যা অপ্রতুল। অবিলম্বে গৃহসম্প্রসারণ করে আরও কয়েকটি শয্যা স্থাপনের জন্য রিষড়া সেবাসদন কর্তৃপক্ষ একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। মহানায়ক রাসবিহারী বসুর পুণ্য স্মৃতিতে এবং নেতাজীর পৌরোহিত্যে কর্মকাণ্ড স্মরণে প্রস্তাবিত ওয়ার্ড উৎসর্গ করা হবে।

এই পরিকল্পনা রূপায়নে বহু অর্থের প্রয়োজন। সহৃদয় দেশবাসী ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শুভেচ্ছা ও আর্থিক সহযোগীতা একান্তভাবে কামনা করি।

২, গ্রীকচার্চ রো এক্সটেনশন, কলিকাতা-২৬
ফোন : ৪৬-৩৪৮৬

নিবেদক—
শ্রীনীলমণি ঘটক (সম্পাদক)

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— যাঁহারা অর্থ সাহায্যে ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে "Rash Behari Netaji Ward Construction fund" এই নামে a/c Payee Cheque অথবা নগদ অর্থ পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সদ্য প্রকাশিত হল :

শ্রীব্রজেন্দ্র চন্দ্র দাস রচিত

অনুশীলন সমিতির বিপ্লব প্রয়াস

মূল্য—মাত্র তিন টাকা

আজই সংগ্রহ করুন

প্রাপ্তিস্থান :

বিপ্লবী পরিষদ

৪, বঙ্কিম দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭

সম্পাদকীয়

সু স্বাগতম

পশ্চিম বাংলার বিধান সভার নির্বাচনে এবার বাম জোট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে মন্ত্রী সভা গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আমরা স্বাগত: জানাই নব নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুকে – স্বাগত: জানাই বাম জোটের অন্যান্য সরিক দলগুলিকেও। সেই সংগে অভিনন্দন জানাই পশ্চিম বাংলার ভোট দাতাদেরও।

পশ্চিম বাংলা এমনই উর্ব্বর যে বর্ষা সিক্ত জলধারায় যেমন তার রূপ কোমল স্বভাবী হেমনি প্রখর রৌদ্রের দাব দাহে তাঁর রূপ পরিবর্ত্তিত হয়ে রুক্ষ রূপ ধারণ করে। বাঙালী আমরা যেমন ভাব প্রবণ কল্পনা বিলাসী আবার তেমনি রুদ্রের মূর্ত্তি ধারণ করে সমাজ বিবর্তনের মধ্যদিয়ে সব কিছুই ওলট পালট করে দিতে পারি।

আজ পশ্চিম বাংলার মানুষ বাম জোটকে ভোট দিয়ে রাজনীতির ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছেন। ১৯৬৭-৬৯ সনের যুক্তফ্রন্টের আমলে প্রশাসনে স্থিতি শীলতা ছিলনা তার কারণ সেবারের যুক্তফ্রন্ট ছিল বহু মতাদর্শের সংমিশ্রণে গঠিত যুক্তফ্রন্ট আর এবারের বাম জোট সমমতাদর্শের দলগুলিকে নিয়েই গঠিত হয়েছে বাম জোট। সুতরাং আমরা প্রত্যাশা করি বর্ত্তমানের এই বাম জোট সরকার সমস্যা জর্জ্জরিত পশ্চিম বাংলার সাধারণ মানুষের কল্যাণে—প্রকৃত দেশাত্মবোধের প্রেরণায় দেশকে অগ্র গতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার কাজে মন দেবে। পশ্চিম বাংলার মানুষ অনেক সন্ত্রাস, অশান্তি ও অরাজকতার মধ্য দিয়ে দিন কাটিয়েছে। আমরা দেখতে চাই সেই সন্ত্রাসের অন্ধকার ময় যুগের অবসান হয়ে মানুষের মনে শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা বোধ ফিরে আসুক। ফিরে আসুক ব্যক্তি জীবনে-সমাজ জীবনে তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে শৃঙ্খলা। সুখী সমৃদ্ধিশালী পশ্চিম বাংলা গড়ে তোলার কাজে বর্ত্তমান বাম জোট সরকার দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করুন এইটাই আমরা দেখতে চাই। আমরা দেখতে চাই বলে কারখানার মালিক ও শ্রমিকের যৌথ উদ্যোগে যৌথ প্রয়াসে একদিকে যেমন উৎপাদন বাড়ুক অপর দিকে উৎপাদনের মূল চালিকা শক্তি শ্রমিক শ্রেণী তার ন্যায় সংগত মজুরী থেকে যেন বঞ্চিত না হয়। আমরা দেখতে চাই লক্ষ লক্ষ বেকারের কর্ম্ম সংস্থানের সুযোগ বিভিন্ন কর্ম সংস্থানের

মধ্য দিয়ে যেন বৃদ্ধি পায়। আমরা দেখতে চাই নিম্ন মধ্য বিত্ত মানুষ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্যের ঊর্দ্ধগতির দরুণ তার পারিবারিক জীবনে যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে সেই দ্রব্য মূল্যের মানকে নিম্নগতি করার জন্য মুনাফা খোর ব্যবসায়ীদের বাধ্য করতে। আমরা দেখতে চাই সুন্দর স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন প্রশাসন। দুর্নীতি আর অনাচারের বিষাক্ত শিকড়কে প্রশাসন ব্যবস্থা থেকে সমূলে উৎপাটন করে সাধারণ মানুষের কল্যাণে প্রশাসন যন্ত্রকে পরিচালনা করা হোক এইটাই আমরা আশা করি নব গঠিত বাম জোট সরকারের কাছ থেকে। আমরা আশা করি সমমতাদর্শের দলগুলি নিয়ে যে বাম জোট সরকার পশ্চিম বাংলার প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তাঁরা স্থায়ী সরকার রূপে জনগণের সেবায় তথা দেশ গঠনে সততা ও নিষ্ঠার সংগেই কাজ করার সুযোগ পাবেন। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকেও তাঁরা পূর্ণ সহযোগীতা পাবেন বলেই আমরা আশাকরব।

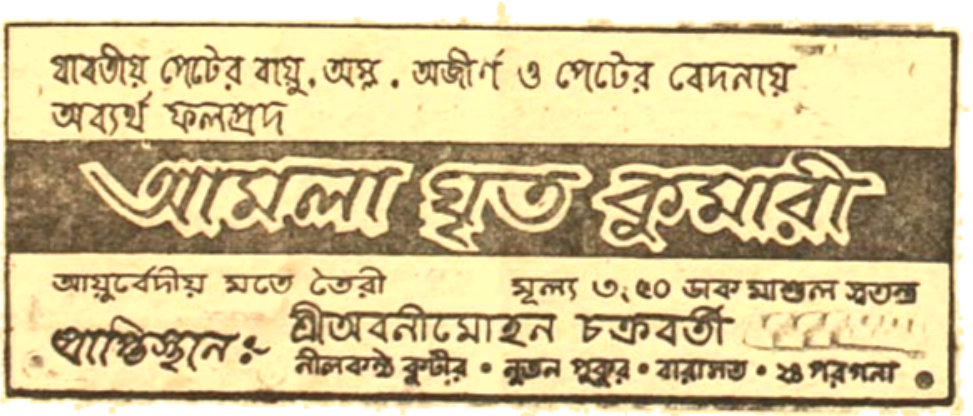

বিপ্লববাদীদের চরিত্র

ডঃ ভূপেন দত্ত

আমাদের স্বাধীনতাবাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে দেখতে গেলে দেখা যায় যে—তা পূর্ণমুক্তির দূত নয়। এরূপ বিপ্লবীদের স্বরূপ কিরকম ছিল বা আছে? ভারতীয় বিপ্লববাদী বা বাংলার বিপ্লববাদী সাধারণের কাছে কিরূপে রক্ষিত হয়ে আছে। অথবা তাদের চরিত্র এতটা হেঁয়ালীপূর্ণ যে সাধারণের বুদ্ধির অগম্য বলে লোকের ধারণা। বাংলার বিপ্লবীদের চরিত্র মূলতঃ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বিপ্লববাদীর চরিত্র থেকে পৃথক নয়; তবে আমি এখানে বাংলা প্রদেশের কথা বলছি, সেইজন্য বাঙালী বিপ্লবীদের কথাই বর্ণনা করছি। সুতরাং একে প্রাদেশিকতা দোষে দুষ্ট বলে অভিযোগ করবার কোন হেতু হবে না। বাংলা প্রদেশের বিপ্লবীরা কি ধরণের জীব, লোকে এখনও উপলব্ধি করতে পারে নি। অনেকের কাছে বঙ্গীয় বিপ্লবীরা "আষাঢ়ে গল্পের" মাল-মসলা হয়ে আছে। অনেক রকম আজগুবি ও রোমান্টিক গল্প তাঁদের নামে প্রচারিত আছে। সাধারণের ধারণা—এরা অদ্ভুত-কর্মা, ক্ষিপ্রহস্ত, কৌশলপূর্ণ ও মৃত্যুভয় শূন্য। সত্যি বলতে, ১৯০২ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কোন্ সাহসিক কাজ না এঁরা করেছেন। বিপ্লববাদ প্রচার করা, বোমা তৈরি করা ও তার ব্যবহার করা, বিদেশী সৈনিক শ্রেণীতে প্রবেশ করা, গোয়েন্দার বিপক্ষে গোয়েন্দাগিরি করা, নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে অত্যাচারীকে শাস্তি দেওয়া, লাঠির বদলে লাঠি চালানো, গুলির উপরে গুলি চালানো, অস্ত্র আমদানির চেষ্টা করা, মরুভূমিতে গিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে কাজ করা, দেশী সিপাহীদের মধ্যে বিপ্লববহ্নি প্রজ্বলিত করবার জন্যে সুদূর কানাডের কাছে কাবুলের মরুভূমিতে শত্রুগুলি উপেক্ষা করে কাজ করার প্রচেষ্টা, মৃত্যু তুচ্ছ করে রাত্রিতে সুদূর কানাডে সাঁতারের উদ্যম, আরো অনেক প্রকারের সাহসিকতা প্রদর্শন ভীরুতা-অপবাদগ্রস্ত বঙ্গভাষী যুবকবৃন্দ দ্বারাই সম্পন্ন হয়েছিল! সাধারণ বাঙ্গালীর কাছে এসব গল্পকথা। কারণ তাঁরা এক জগতে বাস করেন ও বিপ্লবীরা অন্য জগতে বাস করেন।

প্রকাশ্য সভাসমিতি ও কাগজ পত্রাদিতে যা নিয়ে হৈ চৈ তাই সাধারণের কাছে ইতিহাস; আর বিপ্লবীদের কাজ যবনিকার অন্তরালে ও তাদের জগৎ সাধারণের চোখের অগোচরে থাকে, সেই জন্যেই তাঁদের ইতিহাস অপ্রকাশিত থাকে। তবে বিভিন্ন লোকের মুখে শুনে এটাই উপলব্ধি করেছি যে, সাধারণে [যে কোন রাজনীতি মতাবলম্বী হোক না কেন] যুবকদের কাজের জন্যে বাহবা দিয়েছেন, যুবকেরা একটা কিছু সাধারণ বাঙালীর ক্ষমতা-বহির্ভূত সাহসের কাজ করলেই লোকের মনে সৌজন্যভাবে একটা সহানুভূতি বা প্রশংসা জেগে উঠেছে। (১) এই জন্যেই বিপ্লববাদ সকলে গ্রহণ না করুন, বিপ্লবীদের সাহসের কাজ বাংলা প্রদেশের জাতীয় গৌরব ও শ্লাঘার স্থল হয়েছিল। বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে উপলব্ধি করেছি যে, বঙ্গীয় বিপ্লবী যুবকেরা বাঙালী সাহসরূপ ও স্পর্দ্ধার স্থল। এটা যিনি অস্বীকার করেন তিনি সত্য স্বীকার করেন না। এই জাতীয় স্পর্দ্ধাতে হিন্দু ও মুসলমান ভেদ নেই। এমনও দেখেছি যে বাঙালী-মুসলমান প্রথমে মুসলমানী চাল মেরে আমাকে উত্তর দিয়েছিল, "বাংলা ভুল গিয়া বাবু" তারপর পাঞ্জাবী মুসলমানের সঙ্গে কথা কয়ে বুক ফুলিয়ে আমার সামনে বলে, "আমরা বাংলাদেশের লোক, আমাদের দেশের ছেলেরা কলকাতায় ইংরেজকে বোমা মারছে, আমরা কি ১০৲ টাকা মাইনের ইংরেজের সিপাহগিরি করব?"। এই ঘটনাটি যুদ্ধের সময় জার্মানিস্থিত কয়েদী ভারতীয় সিপাই ও খালাসীদের মধ্যে ঘটেছিল)। এটাও সত্যি কথা যে, বাংলার মনুষ্যত্ব এঁরা জাগিয়েছেন। এই জন্যেই আফগান

সীমান্তবাসী পাঠানরাও বাংলার বাহবা করে এবং ১৯১৪খৃঃ ইস্তাম্বুলে যখন একদল ভারতীয় বিপ্লবী ডেপুটেশন এনভার পাশা কর্তৃক গৃহীত হয়, তখন তিনি সর্বাগ্রে বাঙালী বিপ্লবীদের কথাই জিজ্ঞাসা করেন। (২) এঁদের সাহসের জন্যে ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও বাঙালীর খাতির বেড়েছে।

বৈপ্লবিক চরিত্রের উৎস

এইসব বাঙালী যুবকেরা কোন্ প্রেরণায় বলীয়ান হয়ে নিজেকে কোরবানী করত ও মৃত্যু-তাণ্ডবে মুক্ত করত? কোন্ নৈতিকবলে এঁরা অনুপ্রাণিত হয়ে অদ্ভুতকর্মা হয়েছিলেন? কোথা থেকে বল এসেছিল? কোন্ যুগ এর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিল? ভারতের ইতিহাসে দেখি যে মহারাষ্ট্রে ইংরেজ প্রভাবের আগে নামদেব, তুকারাম ও স্বামী রামদাসের ধর্মচর্চা, শিখ জাতির অভ্যুদয়ের আগে বাবা নানক থেকে গুরু গোবিন্দ পর্যন্ত অষ্টগুরুর কর্ম ও উপদেশ, আর বাংলায় কেশব চন্দ্র সেন থেকে নব বৈধাভিক্তদের ধর্মচর্চা দ্বারা বাংলার মহাতেজপূর্ণ নৈতিক শক্তির সঞ্চার হয়। এই নৈতিক শক্তি বাংলার বিপ্লববাদে আত্মত্যাগের মহাপ্রেরণা হিসেবে আবির্ভূত হয়। এক্ষেত্রে এটা উল্লেখযোগ্য যে, যদিও ব্রাহ্ম সমাজ ও তার আন্দোলন বাঙ্গালার নতুন আলো এনেছিল, প্রধানতঃ যে তৎকালীন রাজনীতি বেশীর ভাগ বাঙালী বিপ্লবীদের অনুপ্রাণিত করেছিল। মহৎকে সাহস দেবার জন্যে যেমন "ক্লৈব্যং মাস্ম গম পার্থ" উপদেশ বিপ্লবীরা দান করতেন, তেমনি আত্মোৎসর্গ করবার জন্যে "ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে" তত্ত্বজ্ঞানে তাঁদের নৈতিক বেগ আসত। (১) আগেই বলেছি যে, জাতীয় স্বাধীনতা নামক বিপ্লবপন্থা বিপ্লবীদের কাছে ধর্মের মতন ছিল। এই ধর্মতেজই তাদের সমস্ত কাজের সহায় হয়েছিল। এইখানে আমি সাধারণের কথা বলছি, বিশেষতঃ যাঁরা বিপ্লবপন্থায় যেরূপ স্বতন্ত্র ছিলেন তাঁদের কথা বলছি, অলিন্দ পন্থের ও আদর্শচ্যুত অথবা সুবিধাবাদীদের কথা বলছি না।

বাংলার বর্তমান কালের ইতিহাস তিনবার মহা প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে বাঙালী যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। প্রথম, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সময়, দ্বিতীয় আচার্য কেশব চন্দ্র সেনের সময়, তৃতীয় বিপ্লববাদীদের যুগে। শেষোক্ত কথাটা এখন বেশী 'বক্ত কথা'র মত শোনায় কিন্তু ভবিষ্যতের ইতিহাস এর সিদ্ধান্ত করবে। মহাপ্রভুর সময়ে বাংলার অনেকে যেমন আদর্শে মেতেছিলেন ও স্বার্থত্যাগ করেছিলেন কিন্তু সে আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। কেশবচন্দ্রের আদর্শে বাংলার নবীন যুবক প্রচলিত ধর্ম ও সামাজিক সংস্কার ভেঙে নব ভারত স্থাপন করবেন বলে মেতে ছিলেন। তাঁদের বাড়ি ও সমাজের নির্যাতন সহ্য করতে হত বটে কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলনের লোকেদের মত জীবনের সঙ্গে ছিনিমিনি খেলতে হত না, তাঁরা রাজনীতির ধারে যেতেন না। চৈতন্যদেবের মত হুসেন শাহের বিপক্ষে যেতেন না; অথবা কেশবচন্দ্রও ইংরেজ শাসনকর্তাদের বিপক্ষে যেতেন না; বরঞ্চ 'রাজভক্তি' কেশবচন্দ্রের নববিধান ধর্মের সাইনবোর্ড ছোদির ছিল।

এই দুই পন্থাই "Render unto Caesar, what Caesar's and into God what is God's." নীতি অবলম্বন করতেন। এই জন্যেই এঁরা গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে বাধা বা নির্যাতন পেতেন না। কিন্তু বিপ্লববাদীদের পন্থা অন্যরকম ছিল। "Render unto Caesar, what is Caesar's" এইখানটাতেই তাদের সঙ্গে ঝগড়া। ঘরের পঞ্চনায় গবর্ণমেণ্টের নির্যাতন ভোগ ও প্রাণহানি প্রতিপদে তাঁদের আছে। একে তো গুপ্ত কাজ, সাধারণের সাহায্য নেই, অর্থ সাহায্যের প্রত্যাশা নেই, প্রকাশ্য আন্দোলনের সমস্ত সুযোগ থেকে তাঁরা বঞ্চিত, গুপ্ত কাজের সমস্ত দোষে তাঁরা দোষী, তাঁদের দেবতাদের ও সত্যের চরিত্রের নির্মলতা দেখিয়ে লোককে মুগ্ধ করবার ও সহানুভূতি আকর্ষণ করবার সুযোগ তাঁদের নেই, তাদের কাজে জীবনের মর্যাদাও নেই, তার উপর তাঁরা গবর্ণমেণ্টের কু নজরে পড়েন, সেইজন্যে সমাজের লোক তাঁদের সঙ্গে ভরে মেশে না। এইসব কারণে সমাজের কোথায় তাঁদের কাজের ভরসা হয়েছে?

[বাকি অংশ ১৪ পাতায় দেখুন]

টি্পল এ্যালায়েন্স

দিলীপ কুমার ঘোষ

শীতকালের সন্ধ্যা, স্কুল থেকে ফিরে বেশ মৌজ করেই লেপমুড়ি দিয়ে কাগজখানা মনোযোগ দিয়ে পড়ছিলাম। আচমকা পাড়ার স্বল্পেন্দু মোড়ল ভোঁদড় আর পটকা এসে হাজির। দড়াম করে ঘরে ঢুকে ধুম করে ভোঁদড় চেঁচিয়ে বলে উঠল, "আচ্ছা, তুই তো ইতিহাসের ম্যাষ্টর ; বল দেখি, টি্পল্ এ্যালায়েন্স কি এবং কবে কার সঙ্গে হয়েছিল। অবাক হয়ে গিয়ে বলি, "সেটা হয়েছিল, অষ্ট্রিয়া, ইটালী ও জার্মানীর মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে"। সঙ্গে সঙ্গে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করতে যাই, "কিন্তু তুই হঠাৎ ... ?" বিজ্ঞের মতো ঘাড় নেড়ে পটকা বলে, "আমরা জিজ্ঞাসা করছি, শিক্ষাজগতে কবে এবং কার সঙ্গে কার টি্পল্ এ্যালায়েন্স হয়েছিল ?

নাকের নসি্য মুহুর্তে মুহুর্তে চিন্তিতভাবে বলি, "মনে আসছে না একেবারে"। ভোঁদড় বলে, "মনে পড়ছে না তো কাল একবার ভাল করে টেলিফোন গাইডটা দেখে নিস। আপাততঃ আমি উত্তরের একটু সঙ্কেত দিয়ে যাচ্ছি, উত্তরটা হ'ল," শিক্ষাজগতে টি্পল্ এ্যালেন্স শুরু হয় যখন ইংরাজ শাসকেরা এদেশে এসে তথাকথিত শিক্ষাবিস্তার করতে যারা হয়। বর্তমানে এদেশে শিক্ষাব্যবস্থায় টি্পল্ এ্যালায়েন্সের তিন শরিক আছে। একনম্বর হচ্ছে তোর মতো উটকো ম্যাষ্টরের দল যারা জীবনে কিছু না পেয়ে বা কিছু করতে না পেরে এ পেশাকে পাঠশালার মত আশ্রয় করে বেঁচে আছেন আর মাঝে মাঝে আক্ষেপ করে বলে থাকেন, "মাষ্টারী is the last shelter of a Scoundrel," দুনম্বর শরিক হচ্ছে, মধ্যশিক্ষাপর্ষৎগুলো, স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ যাদের অন্তরের অন্তস্তম ধ্যান, "Advancement of earning" এবং ৩য় পার্টি, ছাত্র ও অভিভাবকের দল, যারা বহুমূল্য দেয় একটা শক্ত কাগজের ওপর ছাপ জোগাড় করার জন্য ; বুঝলি ?

এরকম ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা তোর ইতিহাসের এই-এ পড়েছি কি-না মনে করার জন্য আমাকে মস্তের ডিবা খুলে চিন্তার সাগরে ডুবে যেতে হল কিছুক্ষন চিন্তা করে নিজেকে সামলে নিয়ে ভয়ে ভয়ে প্রশ্নকরি, আচ্ছা তোদের মতে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ত্রুটি কোথায় ? বলি "কি করলে প্রকৃত শিক্ষা হবে আমাকে একটু মিষ্টি করে বুঝিয়ে দে-তো"।

চটে গিয়ে পটকা বলে, "এ লাইনে থেকে পয়সা নিচ্ছিস অথচ এ বিষয়ে কিছু চিন্তা করিস না, এজন্যই তো তোর মাথাটা দিনে দিনে ফাঁকা হয়ে যায় নি এতদিন"। ভয়ে ভয়ে মাথায় হাত দিয়ে দেখি বেশ ঘন চুলই আছে সেখানে। ইতিমধ্যে দুজনেই আরাম করে চেয়ারে বসে পড়লো। চেঁচিয়ে ভোঁদড় বলে, "মন দিয়ে শুনে যা তাহলে আমাদের মতামত"।

"এ শিক্ষাব্যবস্থায় প্র্যাকটিকাল শিক্ষা বলতে গেলে কিছুই নেই, যা আছে সবই নীরস শুকনো লঙ্কার মতো শুধু ঝিয়োগী, যা কিছু কিছু বুঝতে পেরে বা না পেরে অনেক ছাত্রই হয়ে যায় অলস,

অসভ্য, অসামাজিক ও প্রাণহীন। ধীরে ধীরে তাদের বুদ্ধি না বেড়ে ছুরীর ধারের মতো ক্রমে ক্রমে ক্ষয়ে গিয়ে ভোঁতা হতে থাকে, নীরস বিষয়গুলি যা বহু কষ্টে পয়সা, পরিশ্রম ও অনেকের কষ্ট দিয়ে কিনতে হয়, তা শীঘ্রই হিমঘর থেকে আমা মাছের মতোই অল্পসময়ে পচে দুর্গন্ধ বার করে এবং যতদিন যায় ততই তাদের পড়া বইগুলো নিজেদের যাদুঘরেরই শোভা বাড়াবে"।

আকুলভাবে ভাবতে থাকি তবে কি আমরা বৃথাই এত পরিশ্রম করছি? তবে যে আমাদের হেড স্যার সর্ব্বদাই বলেন, স্কুল কখনও কামাই করবেন না, বাবা-মা মারা গেলেও পারেন তো একবার ঘুরে যাবেন। এমনকি নিজের স্ত্রীর বিয়ের দিনেও একবার আসবেন। স্কুল সুরুর ঘন্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট বড়ো লোহার লাল কলম নিয়ে তিনি যে ঘড়ি আর হাজিরা খাতার দিকে চেয়ে স্থির অপলক দৃষ্টিতে ধ্যান করেন তার সবই কি বৃথা? ডুকরে উঠি, কান লাল হয়ে ওঠে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলি, "ভাই, কি রকম শিক্ষাব্যবস্থা চালু হলে তোরা খুশী হবি? দেশ উন্নত হবে? প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বিশদকা সফল হবে?"

ততক্ষণে চা এসে গেছে বললাম, "চা-ই খা। মাসের শেষ; আর কিছু নেই। শুধু শ্রেষ্ঠ শিক্ষাব্যবস্থার কথাটা চা খাবার পর বলতে ভুলে যাস না। কাল একজন মন্ত্রীর মারা যাবার কথা আছে হাক-তে বলে তোদের Suggestion টা চিন্তা করে দেখবো। ভাল মনে হলে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে Urgent-টেলিগ্রাম করে জানাবো বা কাগজে কিংবা লিটল ম্যাগাজিনে ছাপাতে পাঠাবে।

ইতিমধ্যে ওরা দুজনে আরাম করে চোখবুজে বিড়ের মতো বিড়ি উপভোগ করতে ব্যস্ত রইল। কিছুক্ষণ বাদে চোখখুলে গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসে ভোঁদড় স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বলতে শুরু করল "প্রকৃত শিক্ষা হচ্ছে তা-ই যাতে Practical জিনিষটা শেখানো হয় বেশী যা জীবনে কাজে লাগে বা মনে ছাপ রাখে বা মনকে উন্নত করে, জীবন ক্ষুদ্র; গড়ে মোটামুটি বাট বছর। অকারণে শুকনো খড় আর পচা কাঠ দিয়ে মাথাটা বোঝাই না করাই ভালো প্র্যাকটিক্যালের সঙ্গে সঙ্গে যদি থিয়োরী কিছু কিছু শেখানো হয় তবেই তার অর্থ ছাত্ররা বুঝবে। তবে শিক্ষার ইমারতে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের সিমেন্ট দিয়ে গাঁথনি শক্ত করতে হবে। শিক্ষা দেবার সময় দুপুর নয়, সকাল, এবং সন্ধ্যা-দুপুরে যা আয়ত্ব করতে তিনঘন্টা লাগে, রাত্রে তা লাগে একঘন্টা, এবং মনের মধ্যেও ভালভাবে প্রতিবিম্বিত হয়। আসল কথা হ'ল কাজের সঙ্গে শিক্ষাকে জড়িত করো।

ছয় থেকে দশবছরের ছেলেদের বাড়াতে হবে উপস্থিত বুদ্ধি, সাধারণ জ্ঞান, বাস্তববুদ্ধি ও আচার ব্যবহারের মাধুর্য্য। শিক্ষার্থী লাঙল চালাবে, গাই দুইবে, ড্রিল করবে ও প্রাথমিক গ্রামবাসনাও শিখবে, তবে তার সঙ্গে একটা কি দুটো পেশাগত বৃত্তি যা তার ভাল লাগে এবং ভবিষ্যতে কাজে লাগে তা বেশীক্ষণ শিখবে। ইতিহাস ভূগোল সে শিখবে বই কি। তাতে অতি সংক্ষিপ্ত সরল ভাষায় প্রধান ঘটনাগুলো যা তার অনেকদিন মনে থাকে ও কাজে লাগে সেগুলিই শুধু থাকবে। ইতিহাসের অপ্রধান ঘটনাগুলো থাকবে অতি সংক্ষেপে কেবল ঘটনার যোগসূত্র রাখার জন্য। ভ্রমণ, ব্যায়াম ও খেলাধুলা হবে সব শিক্ষার্থীর আবশ্যিক। লাজুক, কবি বা অলসপ্রকৃতির ছেলেদের সাহিত্য বা অঙ্কনে

রুচি থাকলে তা জাগিয়ে তুলতে হবে, প্রত্যেক ছাত্রের সাধারণবুদ্ধি বাড়ানো মূল্যবোধ শেখানো আর চৌখস করে গোড়া তোলা একান্ত প্রয়োজন। বড় ছেলেরা শিখবে প্রাথমিক অঙ্ক, যুদ্ধবিদ্যা, রান্না, গাড়ীচালানো, রাজনীতি, সাধারণ জ্ঞান, টাইপরাইটিং, সংক্ষিপ্ত সমাজবিদ্যা, বিশ্বসাহিত্য আচার ব্যবহার ও অবশ্যই সেলাগত কিছু। তাদের চালচলন ও কথাবর্তায় স্মার্ট করে গোড়া তোলা উচিৎ। কেবল অতিভদ্র, লাজুক কিছু ছাত্র আঁকা শিখবে, বাগান করবে, প্রাথমিক ঘড়ি, রেডিও ও ইলেকট্রিক মেরামত, সাংবাদিকতা বা লাইব্রেরীয়ান শিপ শিখতে পারে। তবে সবাইকেই প্রথমথেকে খুব ভালভাবে বাছাই করতে হবে। সবার চেয়ে বড় কৃতিত্ব হবে যদি মাষ্টাররা ঠিক বেছে বার করতে পারেন কোন ছেলের সহজাত প্রতিভা ও ঝোঁক কোন বিষয়ের ওপর তাকে পরিচলনা করতে হবে সেই লাইনে, এজন্য দরকার দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, তীক্ষবুদ্ধি সম্পন্ন কেরিয়ার মাষ্টারের। তাঁর দায়িত্ব অনেক। তাঁকে প্রচুর পরিশ্রম করে ছাত্রদের সঙ্গে মিশে তাদের তরুণ হৃদয়ের অন্তর্নিহিত সঙ্গীতের সুর পাকা ডিটেকটিভের মতো ধরতে হবে। তবে কেরিয়ার মাষ্টার যদি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিগ্রোমা বাগিয়ে এবং কোন কাজ না করে শুধু ডুবু হয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে স্কুলের মাহিনার খাতায় নিজনামের পাশের মুখস্থ সংখ্যা-গুলোর দিকে ধ্যানময় পুলকিত দৃষ্টিতে কেবল অপলক চেয়ে থাকেন তবে অনেক প্রচেষ্টাই হবে বৃথা"।

ভোঁদড় দীর্ঘসময় বক্তৃতা করে হাঁফাচ্ছিল। সে থামলে পটকা শেষটুকু যোগ করল। সে বলে চলল, "একটা কথা কিন্তু সবসময়ে মনে রাখেন যা আর তা হচ্ছে যোগ্য শিক্ষক নির্বাচন। অনেকগুলো ছাপমারা শক্ত কাগজ অর্জন করলেই ভাল নির্দেশক হওয়া যায় না। পথপ্রদর্শক হবেন কঠিনে-কোমলে ভরা তীব্র বাস্তব বুদ্ধিজ্ঞান সম্পন্ন আধুনিক জ্ঞান ও জগত সম্বন্ধে ভ্রাম্যমান ছোট অভি-ধানবার কণ্ঠস্বর হবে পরিষ্কার, চিন্তাধারা স্বচ্ছ, বোঝাবার ক্ষমতা প্রাঞ্জল, অথচ ভাষণ সংক্ষিপ্ত। তাঁর বক্তব্য তথ্যভারে বৃদ্ধের মতো ধুবু হবে না। প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত সব ছাত্রকেই যেন তিনি খুশী করতে পারেন, তাঁকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে তাঁর বক্তৃতার সময় কেউ যেন পা দা চুলকায়। একঘেয়েমি এড়াবার জন্য ও ছাত্রদের সজাগ রাখবার জন্য তিনি নিজে একটানা বক্তৃতা না দিয়ে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষা দেবেন। ছাঁকনি দিয়ে হ্যারিকেনে কেরোসিন ঢালতে গিয়ে মাঝে মাঝে ছাঁকনি তুলে দেখতে হবে, তেল হ্যারিকেনের ঠিক মধ্যে যাচ্ছে না মেঝে দিয়ে নর্দমা পার হয়ে স্কুলের গেটের বাইরে চলে যাচ্ছে"।

এমন সময় দরজায় কড়া নাড়া পড়লো। দেখি আর এক লেকচার বাগিশ, পাড়ার স্কুলে মাইক মন্ত্রী ভ্যাবলা পাড়ায় যম পুজার জন্য চাঁদার খাতা নিয়ে হাজির। চাঁদার খাতা দেখলেই আমার মুখে ঘনিয়ে আসে আষাঢ়ের কালো আঁধার। কিন্তু সে কিছু না বলে জাঁকিয়া বসে আমাদের সংলাপের সংক্ষিপ্তসার বুঝে নিল।

আমি মাথা চুলকে বিনীতভাবে ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলাম, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ছাত্ররা তাহলে কি শিখবে? ওরা কি কেবল বেলঘট তৈরী করা শিখবে আর সিনেমার নায়কদের জীবনী মুখস্থ করে ভবিষ্যত তৈরী করবে?

ক্যাবলা চটে উঠে বলে, "বলতে দাও আমাকে ; তাদেরও কাজ আছে। ওরা শিখবে দেশের প্রাথমিক আইন কানুন, সংক্ষিপ্ত ডাক্তারী, স্টেনোগ্রাফী, শিকার, খেলাধুলা, সাধারণ জ্ঞান, বিশ্ব ও দেশীয় সাহিত্যের সংক্ষিপ্তসার ও সমাজসেবা থিয়োরী একভাগ, প্র্যাকটিক্যাল তিনভাগ। দেশবিদেশের সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক ও অন্যান্য সংবাদ, ইতিহাস, ভূগোল, ছোট খাটো কাঠের কাজ, গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা লেখা ও অল্পস্বল্প বা কাপড়বোনা, ব্যবসা প্রাথমিক অফিসের কাজ, বই বাঁধাই ও কোম্পানীর শিক্ষানবীশি। সপ্তাহেলেই ভোরে দু'ঘণ্টা ড্রিল, ব্যায়াম ও কুচকাওয়াজ করবে, এরপর ছোট ছেলেরা দুপুরে শিক্ষকদের অধীনে ছোট খাটো কুটীর শিল্পে নিযুক্ত থাকবে এবং বড়ছেলেরা কোন ফ্যাক্টরী, অফিস, মিউনিসিপ্যালিটি, সিনেমা দোকান, কারখানা, ব্যাঙ্ক বা ব্যবসায়ে শিক্ষানবীশী হিসাবে কাজ করে কিছু কিছু ভাতা পাবে। সন্ধ্যার উত্তরেই আবার থিয়োরী নিয়ে পড়াশুনা করবে। বলাবাহুল্য উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতে পদশূন্য হলে উক্ত শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকেই নেওয়া সরকার থেকে বাধ্যতামূলক করা হবে। শিক্ষার্থীদের গঠন পাঠন চলাকালে মাঝে মাঝে যেমন অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা থাকবে তেমন দু'মাস ছাত্ররা গ্রীষ্মকালে শীতপ্রধান ও শীতকালে অন্যান্য জায়গায় ভ্রমণ করতে গিয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করবে। সে সময় তারা সাইকেল চালাবে, ক্যাম্পিং করবে, রান্না করবে, গাছপালা ও প্রকৃতির চরিত্র জানবে ও স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে মিশবে, নাচগান ও পিকনিক করবে"।

কিন্তু অতো পয়সা আর গুণী বিষয় অভিজ্ঞ মাষ্টার কোথায় পাওয়া যাবে ?" চীৎকার করে উঠি আমি। তদোধিক জোরে তিনজনে, ভেংচিয়ে উত্তর দেয়, যে পয়সায় এইসব শুকনো মাষ্টার কিনছো, সেই পয়সায় ঐ সব জ্যান্ত মাষ্টারদের পাবে-আর এখন তোমাদের কি যেন বি, টি, ট্রেনিং কলেজগুলো আছে যেখানে আরগুলা আর টিকটিকির ডিম পাড়া শেখায় সেখানেও মাষ্টারদের ঐ সব থিয়োরেটিক্যাল আর প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং দেওয়া হবে"।

ইতিমধ্যে হঠাৎ লোডশেডিং হল। ওদের কথাও বোধ হয় শেষ হ'ল ওরা চলে গেল। অন্ধকারের মধ্যে মশা মারতে মারতে গভীরভাবে চিন্তা করতে করতে কেবল একটা কথাই মনে হতে লাগলো যে, পাড়ার স্বঘোষিত নেতাও চাঁদা-মন্ত্রীরা স্বাভাবিক বুদ্ধি দিয়ে যা চিন্তা করতে পারে, দেশের শত সহস্র কাগজে মেডেল পাওয়া শিক্ষার টিকিধারী কুলীনেরা শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তনে সে লাইনে একবারও চিন্তা বা চেষ্টা করে দেখেন না ?

বাংলাদেশ

ঊনসত্তর থেকে পঁচাত্তর

। মিহির কর্মকার ।

[দশ]

বাইশে ফেব্রুয়ারী আইয়ুব খান জনতার দাবীর কাছে নতি স্বীকার করেন এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে নেন। আগরতলা মামলা প্রত্যাহার মানে ঢাকার কাছে ইসলামাবাদের পরাজয়। শেখমুজিব-সহ সকল বন্দীকে মুক্তি দেয়া হয়। মুক্তি পান অন্যান্য রাজবন্দীরাও।

শেখমুজিবের মুক্তির খবর রেডিওযোগে প্রচারিত হবার সাথে সাথে হাজার হাজার মানুষ আনন্দে একে অপরকে আলিঙ্গন করতে থাকে। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য।

কারাগারের অন্ধকোঠা থেকে মুজিবের মুক্তি বাঙালী জাতির সার্বিক মুক্তিকেই ইঙ্গিত দেয়। উদ্বেলিত জনতা মুজিবের কণ্ঠ শোনার জন্য পাগল। কতদিন শোনে না ঐ অগ্নিকণ্ঠ। কতদিন দেখেনা প্রাণের নেতাকে। যে নেতা বাংলা ও বাঙালীর মুক্তির জন্য মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এসেছেন।

তেইশে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯।

স্থান-সোহরাওয়ার্দী উদ্যান।

প্রায় দশলক্ষ জনতা সমবেত হয়েছে প্রাণপ্রিয় নেতা শেখমুজিবকে একনজর দেখতে ও তাঁর মুখের কথা শুনতে। সভার উদ্যোক্তা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও আওয়ামী লীগ।

সভামঞ্চে মুজিব হাত তুলে জনতাকে অভিবাদন জানাবার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের প্রলয় গর্জনের মতো জনতার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ তাদের নেতাকে জানিয়ে দিলো—হে মহাত্মা, আমরা তোমার সাথে আছি। যে লক্ষ্য সাধনের জন্য তুমি প্রত্যয়বদ্ধ, এগিয়ে যাও নির্ভয়ে, প্রয়োজনে রক্ত দিয়ে প্রমাণ করবো আমরা তোমার যোগ্য সাথী।

সভায় এগারো দফা আন্দোলনের নায়ক জনাব তোফায়েল আহমেদ জনতার পক্ষ থেকে শেখ মুজিবকে "বঙ্গবন্ধু" উপাধিতে ভূষিত করেন। ঘটিচিত্তে জনতার দেয়া 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি গ্রহণ করে বলেন দোয়া করবেন, মৃত্যুর শেষদিন পর্যন্ত বাংলা ও বাঙালীর বন্ধু হয়ে যেন কাজ করতে পারি।

জনতার উত্তাল সমুদ্রে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু বাঙালী জাতীয়-তাবাদের মহামন্ত্র উচ্চারণ করেন। তিনি বলেন বাঙালীরা একটি স্বতন্ত্র জাতি। এর নিজস্ব সংস্কৃতি-কৃষ্টি-সভ্যতা রয়েছে। এর ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। পশ্চিম পাকিস্তানীদের সাথে বাঙালীদের কোন মিল নেই। তিনি আরো ঘোষণা করেন, অনেক দুঃখ কষ্ট, জেল জুলুম সহ্য করেছি, প্রয়োজন হয় সহ্য আরো করবো কিন্তু দেশবাসীর সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করতে পারবো না। স্বাধীন আবাসের সংগ্রামে সব সময় মেহনতী মানুষের কাতারে থাকার অঙ্গীকারও তিনি করেন। তিনি কবিগুরুর ভাষায় আবৃত্তি করেন—

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী—
ওরে ভয় নাই, ওরে ভয় নাই
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান—
ওরে ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।

মওলানা ভাসানীর রাজনীতি সব সময় অস্পষ্ট। বঙ্গবন্ধু যখন কারাগারে, জনতার কণ্ঠে যখন "জেলের তালা ভাঙার গান" ভাসানী তখন জনতার কাতারে। মিছিলের অগ্রভাগে। গণআন্দোলন যখন সাফল্যের পথে, মুক্তির একক বিন্দু যখন সুনিশ্চিত, তখনই ভাসানী রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অস্পষ্ট এবং ঝোঁয়াটে।

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান যখন সাফল্যের শিখরে, ভাসানী সাহেব তখন আন্দোলনের ধারাকে নস্যাৎ করার জন্য নতুন স্লোগান তোলেন—আলো আলো আরও আলো। ধ্বংসাত্মক পদ্ধতি অবলম্বন করায় আন্দোলনের পবিত্র রূপ ডাকাতীতে পরিণত হয়। চোর, ডাকাত সহ খারাপ চরিত্রের অনেকেই আন্দোলনের এই ধ্বংসাত্মক ধারাকে হাতিয়ার হিসাবে কাজে লাগায়।

ভাসানী সাহেব প্রথমে বলেছিলেন, শেখমুজিবকে সঙ্গে না নিয়ে তিনি গোলটেবিল বৈঠকে যাবেন না, যেতে পারেন না। মুজিব যখন কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে, গোল টেবিল বৈঠকে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিলেন, ভাসানী তখন বলেন, গোল টেবিলে তিনি আদৌ যেতেন না। তার চাপায় গোল টেবিল ভাওতা মাত্র। কাজের কাজ কিছু হবে না।

বঙ্গবন্ধু মুজিব আওয়ামী লীগের এক উচ্চ পর্যায়ের সহযোগীদল নিয়ে রাওয়ালপিণ্ডি রওনা হলেন। হাজার হাজার বাসুচ সিন্ধী মুজিবকে প্রাণঢালা অভ্যর্থনা জানায়। সিন্ধুর নেতা জি. এম. সৈয়দ সিন্ধী জনগণের পক্ষ থেকে তাকে অভিনন্দন জানালেন। তিনি 'জয় সিন্ধ' স্লোগান তুলে 'জয়বাংলা স্লোগানের সাথে ভ্রাতৃত্বের বাণী শুনিয়ে দেন। পরবর্তী কালে এই জি. এম. সৈয়দ বঙ্গবন্ধুর একনিষ্ঠ সমর্থক হিসাবে কাজ করেছেন। তিনিও বঙ্গবন্ধুর মতো সিন্ধী জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার আদায় করতে বদ্ধপরিকর।

শুরু হোল গোল টেবিল বৈঠক। ভুরুসআমীন, নবাবজাদা নসরুল্লাহখান, মাওলানা মওদুদী, ওলী খান, আসগর খান প্রমুখ নেতার উপস্থিতিতে শুরু হোল গোল টেবিল বৈঠক। বৈঠকের আহ্বায়ক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব

বৈঠকে মুজিবের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। কেননা তিনি নানা ঘটনার পরি-প্রেক্ষিতে তিনিই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। বৈঠকে আইয়ুব খান পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার গঠনের এবং প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী মেনে নিলেন।

সকল নেতাই এ ভাবে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং খুশীতে উচ্ছলিত হয়ে উঠেন। একমাত্র শেখমুজিবই বৈঠকে দৃঢ় ভাবে বলেন, পার্লামেন্টারী ডিমোক্রাসী দিলেই পূর্ববাংলার শোষণ বন্ধ হবে না। আর্থিক অর্থ-নৈতিক শোষণ বন্ধ না হোলে পার্লামেন্টারী ডিমোক্রাসী জনগণের কোন কল্যাণেই আসবে না। তাই শোষণ ও বৈষম্য দূর করতে হোলে প্রয়োজন পূর্ণ স্বায়ত্ব শাসন। তাই তিনি ৬'দফা প্রস্তাব মেনে নেয়ার জন্য আইয়ুব খানকে পরামর্শ দেন।

ছ'দফার নাম শুনতেই আইয়ুব খান চটে গেলেন। সামরিক মেজাজের লোক। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন— ছ'দফার নাম শুনতে তিনি রাজী নন। ছ'দফাকে তিনি পাকিস্তানের অস্তিত্বের প্রতি হুমকি স্বরূপ বলে উল্লেখ করেন। তিনি মুজিবের দেশ প্রেম সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন, মুজিব পাকিস্তানকে ভালোবাসেন না। তিনি শুধু বাঙালীদের নিয়েই ব্যস্ত।

দেশী বিদেশী বহু সাংবাদিক মুজিবের সাক্ষাৎকারের জন্য তাকে ঘিরে থাকেন। গোল টেবিলে অংশগ্রহণকারী নেতাদের সংখ্যা তো কম নয়। কিন্তু তারা শুধু মুজিবের সাক্ষাৎকার চান। তারা জানতে চান পাকিস্তান সম্পর্কে মুজিব কি ভাবেন।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি স্পষ্টভাবে বলেন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসন বাঙালীদের শোষণ করেছে এই শোষণ বন্ধ করতে হবে। বাঙালীরা স্বায়ত্ব-শাসন চায়। দাবী আদায়ের প্রশ্নে বাঙালীরা বেপরোয়া। তাদের কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না।

অবশেষে ১৪ই মার্চ, ১৯৬৯ শেখমুজিব গোলটেবিল বৈঠকে ব্যর্থতা করে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন। সেদিন বিমান বন্দরে লক্ষ লক্ষ জনতা তাদের প্রাণপ্রিয় নেতাকে স্বাগত জানায়। বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের সাথে আলাপ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলেন, যে জনগণ তাদের রক্ত দিয়ে আমাকে জেল থেকে মুক্ত করেছে, সেই জনগণের স্বার্থকে, উপেক্ষা করেছে, অবাক করেছে, তাই আমি চলে এসেছি।

বৈঠক করে কোন জাতীর সঠিক মুক্তি আসে না। ইতিহাসে দেখা যায় বৈঠক মানেই আপোষের কয়মূলা। উভয় পক্ষই কিছু দিতে ও নিতে প্রস্তুত। ভারত স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রারম্ভে দেখা গেছে কংগ্রেসের কিছু সংখ্যক নিনিয়র নেতা বৃটিশের সাথে বৈঠক করে, দর কষাকষি করে ধাপে ধাপে স্বাধীনতার পথে এগোবার পক্ষে বক্তব্য রাখতেন। তারা সরাসরি বৃটিশের সাথে সংঘর্ষে রাজী ছিলেন না। পরবর্তী কালে বাংলার বিপ্লবীদের গুপ্ত সংগঠন বিপ্লবী সংগঠন ও অনুশীলন জন্ম হওয়ার পর এবং স্থানে স্থানে বিপ্লবী কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়ার, তারা বুঝে নিয়েছেন—স্বাধীনতার জন্য কি চাই।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সেই কণ্ঠস্বর। give me blocd I shall give you freedom. আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব। স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন উদ্বুদ্ধ জনগণ, যারা রক্ত দিতে সদা প্রস্তুত, আর প্রয়োজন যোগ্যতা সম্পন্ন নেতা।

বঙ্গবন্ধুও জানতেন বৈঠক করে বাঙালীর মুক্তি আসবে না। স্বাধীনতার জন্য সর্বশেষ ও সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে সশস্ত্র পথ। নিরস্ত্র বাঙালীকে সশস্ত্র করতে সময় ও কৌশল দরকার। তাই তিনি চেয়েছিলেন, দেশে ডিমোক্রাটিক এ্যাটমোসফীয়ার এলে এবং আওয়ামীলীগ পাকিস্তানের মূল নেতৃত্বে যেতে পারলে পূর্ববাংলা থেকে পাঞ্জাবী সৈন্য সরিয়ে দিয়ে বাঙালী, ছেলেদের দিয়ে গড়ে তোলা হবে পূর্ববাংলার সেনাবাহিনী। তাছাড়া পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক শাসন ক্ষমতায় আওয়ামীলীগ আসীন হতে পারলে গোপনে আওয়ামী লীগ কর্মীদের ট্রেনিং দিয়ে সশস্ত্র করা হবে। তারপর একদিন ঘোষণা করা হবে পাকিস্তানের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার অভিলাষ।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতারা বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করতে গেলে তিনি গম্ভীর অথচ দৃঢ়ভাবে বলেন তোমরা আমার উপর আস্থা রাখো, স্বাধীনতা একদিনে আসে না, তা তোমরা জানো। স্বাধীনতার জন্য চাই উপযুক্ত কর্মসূচী ও সময়।

সদ্য কারামুক্ত তরুণ বুদ্ধিজীবি ও প্রাক্তন ছাত্রনেতা কজলুল হক মনি রক্তসম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে। বঙ্গবন্ধুর বড়বোনের পুত্র। শেখ মনি স্কুল ছাত্র থাকা কালেই বঙ্গবন্ধু তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। তিনি শেখমনির মাকে গিয়ে বলেছিলেন—'বু (দিদি) তোমার এই ছেলেকে আমি চাই'।

মণিকে যখন মুজিবের প্রয়োজন, তখন মুজিব-ভক্তি নিয়ে কথা তুলতে পারেন না। বঙ্গবন্ধু শেখমণিকে চেয়েছিলেন, বাঙালীর দুর্ভাগ্য, তিনি মণিকে পরলোকেও সঙ্গী করে নিলেন। তাই মণি-মাতা আজো কাঁদেন।

যাহোক শেখমণিকে বঙ্গবন্ধু নির্দেশ দিলেন, একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করতে। এই পত্রিকার মাধ্যমে স্বাধীনতার বাণী বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। বঙ্গবন্ধুর আশীর্বাদ নিয়ে সাপ্তাহিক বাংলার বাণী পত্রিকা শেখ কজলুল হক মণির সম্পাদনায় আত্মপ্রকাশ করলো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে নিয়ে। আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় অফিসের একটি কক্ষে এর কার্যালয় গড়ে তোলা।

জনতার আন্দোলন চলছে। মুসলিমলীগের গণ-বিরোধী নেতা ও বি, ডি মেম্বারদের বাড়ীঘর পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। জনতার ক্ষুব্ধ আক্রোশে অনেকে প্রাণ হারাচ্ছে। বিভিন্ন শ্রেণীর গুণীদের আইয়ুব খান প্রদত্ত খেতাব বর্জিত হচ্ছে। এমনি অবস্থায় গভর্ণর মোনেম খান একদিন কাউকে না জানিয়ে বিমানে করে সংগোপনে বাংলা ছেড়ে পিণ্ডি চলে গেলেন।

শোনা যায়, বিমান বন্দরে তিনি সহকর্মীদের কাছে চোখের জল ফেলে বলেছিলেন, এভাবে দেশ ছেড়ে পালাতে হবে কখনো ভাবিনি।

মোনেম খান ঢাকা প্রস্থান করার পর বেশ কিছু গভর্ণর ছাড়াই গভর্ণর ভবনে পতাকা উত্তোলিত হয়। অবশেষে ২২ শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক, মোনেম কেবিনেটের অর্থমন্ত্রী তমিজউদ্দিন খাঁর জামাতা ডঃ মীর্জা হুকুল হুদা গভর্ণর হিসেবে শপথ নেন। ডঃ হুদা ব্যক্তি হিসেবে অমায়িক হোলেও, মুসলিমলীগরা তাকে আপনজন মনে করতো। আইয়ুব খান দুটো কারণে তাকে মনোনয়ন দেন—(১) তিনি মুসলিমলীগের স্বার্থের পরিপন্থী কোন কাজ করবেন না; (২) যতক্ষণ পর্যন্ত সামরিক শাসন জারী করা না হয়, শিক্ষাবিদ হিসেবে তিনি চমৎকার বাককৌশল দিয়ে ছাত্র সমাজকে আন্দোলন থেকে বিরত রাখবেন।

ডেইলে মার্চ ডাঃ এম, এন, হুদা বেতিও যোগে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করেন। তিনি বলেন, ছাত্রসমাজ তার প্রিয়। দীর্ঘ দিন তিনি শিক্ষকতা করেছেন, তিনি বুঝেন (তার ভাষায়) ছাত্রদের দুঃখ কি, সমস্যা কি? তিনি আশ্বাস দেন, সকল সমস্যার সমাধানে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করবেন।

[চলবে]

'সুভাষবাদ—সমাজতন্ত্রের নতুন তত্ত্ব'

॥ শ্রীজ্ঞান হালদার ॥

শ্রেণী সংগ্রামের বিবেকানন্দ সুভাষচন্দ্রের ব্যাখ্যা

(পূর্বানুবৃত্তি)

আমাদের আলোচনাকে অগ্রসর করে নিয়ে যেতে হ'লে নেতাজীর এই মূল কর্মসূচীর সঙ্গে আগে পরিচিত হওয়া দরকার—"আমি যা বলেছি তার সংক্ষিপ্তসার হল আমি ভারতবর্ষে একটি সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র চাই। যে বাণী আমার প্রচার করবার আছে তা হ'ল পূর্ণাঙ্গ, সাম্যিক, অবিমিশ্র স্বাধীনতা। যতদিন না চরমপন্থী অথবা বিপ্লবী-দের সংগ্রাম শুরু হচ্ছে ততদিন আমরা স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত থাকব। ...

কংগ্রেসের নীতি ও কার্যক্রমের ত্রুটি হ'ল এই যে এ গুলির মধ্যে প্রচুর অস্পষ্টতা আছে এবং নেতাদের মনে এক রকমের দ্বৈতত্ব বা সংরক্ষণ রয়েছে। তাঁদের কার্য-ক্রমের ভিত্তি চরম পন্থা নয়, আপোষরফা বা সমঝোতা—এ আপোষ হচ্ছে জমিদার ও ভাগচাষীর মধ্যে, পুঁজিপতি ও বেতনভোগী মধ্যে, তথাকথিত উচ্চতর শ্রেণী এবং তথাকথিত অবদমিত শ্রেণীগুলির মধ্যে পুরুষ এবং নারীর মধ্যে।

আমি বিশ্বাস করি না কংগ্রেসের কর্মসূচী ভারতের স্বাধীনতা আনতে পারবে। আমার বিশ্বাস নিম্নলিখিত কর্মসূচীর ভিত্তিতেই আমরা স্বাধীনতা অর্জন করতে পারি :—

১। কৃষক এবং শ্রমিকদের সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীর ভিত্তিতে সংগঠিত করা।

২। কঠোর শৃঙ্খলার সঙ্গে যুবশক্তিকে ভলান্টিয়ার কোরের মাধ্যমে সংগঠিত করা।

৩। বর্ণপ্রথার বিলোপ সাধন এবং সমস্ত রকমের সামা-জিক ও ধর্মনৈতিক কুসংস্কারের উচ্ছেদ।

৪। নতুন কর্মসূচীর আদর্শ গ্রহণ করা এবং বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যে নারীদের সংগঠিত করা।

৫। বৃটিশ দ্রব্য বর্জনের তীব্র আন্দোলন।

৬। নতুন সংস্কৃতি এবং নতুন কার্যক্রমের প্রচারের জন্যে নতুন সাহিত্য সৃষ্টি করা।

(নওজোয়ান ভারত সভা বক্তৃতা, লাহোর, ১৯৩১, (সিলেক্টেড স্পিচেস, পৃঃ-৯২)

নেতাজীর উপরোক্ত কার্যক্রম সার্বিক। এবং কার্যক্রম গুলি কিভাবে পর পর গুরুত্ব অনুযায়ী সাজানো হয়েছে বিশেষ লক্ষ্যণীয়। জাতিভেদ সম্পর্কেও নেতাজীর বক্তব্য খুব সহজ! উপরোক্ত দ্রষ্টব্য ছাড়াও বহু জায়গায় তিনি বলেছেন যে সবাইকে ব্রাহ্মণ হতে হবে, অন্যথায় মুক্তি। একটি মাত্র বর্ণ বা জাতিই কেবল রাখা যেতে পারে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য জাতি বর্ণ সমস্যার সঙ্গে শ্রেণী সমস্যা ভারতে সমার্থক, অন্ততঃ বহুলাংশে। সেই দিক থেকেই নেতাজী এই বিষয়টির গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

আরো কয়েকটি প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দেওয়া হ'ল—"কিন্তু আমি এই কথা জানতে চাই যে শ্রমিক, কৃষক এবং অব-দমিত শ্রেণীগুলিকে নিজস্ব জোরের ভিত্তিতে সংগঠিত করতে না পারলে অসহযোগ আন্দোলন কখনো সফল হবে না।" (লাহোর কংগ্রেস বক্তৃতা, ঐ পৃঃ-৬১)

"সত্য ও ন্যায়ের উপর আমাদের জাতীয়তা যদি প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে সে জাতীয়তা একদিনও টিকিতে পারে না। এই জন্যে আমি সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক বা কৃষক সম্প্রদায়কে স্বরাজ আন্দোলনের পরিপন্থী বলে মনে করিই না—বরং আমি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিব যে, তাহাদের সহযোগ ব্যতীত স্বরাজ লাভের আশা দুরাশা মাত্র এবং তাহারা যে পর্যন্ত সঙ্ঘবদ্ধ না হইতেছে ততদিন তাহাদিগের পক্ষে স্বরাজ আন্দোলনে অথবা সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক পুনর্গঠনের কাজে যোগদান করা সম্ভবপর হইবে না।"

(যুব সম্মেলনে ভাষণ, কলকাতা, ১৩০৪ তরুণের স্বপ্ন, পৃঃ ১০৫-৩৬)

বর্তমান আলোচনা শেষ করার আগে শ্রেণী সংগ্রামের বিবেকানন্দ সুভাষচন্দ্রের ব্যাখ্যা সম্পর্কে সাধারণভাবে কয়েকটা কথা বলে নেওয়া চলে। এই ব্যাখ্যার মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি সমস্ত লেখাটিতে আলোচনা করা হয়েছে। এখন এগুলিকে আবার পর পর সাজিয়ে নেওয়া যাক।

বিবেকানন্দ-সুভাষচন্দ্র প্রগতির কোন সরল রৈখিক গতিতে বিশ্বাস করেন না। বিবেকানন্দ সবচেয়ে যুক্তি-সঙ্গতভাবে প্রমাণ করেছেন যে ক্রমবিকাশ থাকলে ক্রম সঙ্কোচ থাকবেই। সেই হিসেবে সর্বহারা শ্রেণীর ক্ষমতা

দখলই সভ্যতার শেষ পর্যায় নয়, বৃত্তাকারে প্রত্যেকটি শ্রেণীর আধিপত্যই পুনরাবৃত্ত হয়। কাজেই কোন শ্রেণীর একনায়কত্বই মূলতঃ কাম্য হতে পারে না, বিবেকানন্দ এবং নেতাজী দেখিয়েছেন সমস্ত শ্রেণীগুলির সাধারণ গুণগুলির এবং আধুনিক পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতীয় সংস্কৃতিগুলির সচেতন বৈজ্ঞানিক সমন্বয়ই আদর্শ সমাজ গড়ে তুলতে পারে। যদিও যে কোন ইউটোপীয়া সম্বন্ধে বিবেকানন্দের সংশয় তাঁর উক্তিরই এক জায়গায় ব্যক্ত হয়েছে।

বিবেকানন্দের সাধিক চেতনারই রাজনৈতিক রূপ দিতে গিয়ে নেতাজী দেখিয়েছেন যে শুধু আদর্শ সমাজ ব্যবস্থাই সমন্বয়ের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে না, সেই সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামেও দরকার সমন্বয়ের। এই এই সমন্বয় হ'ল জাতীয়তা আর সমাজতন্ত্রের, জাতীয়তা আর আন্তর্জাতিকতার। এই হিসেবেই প্রয়োগিক ক্ষেত্রে শ্রেণী সংগ্রামের ভিত্তিতে পৃথক বিপ্লবের অপ্রয়োজনীয়তা তিনি তুলে ধরেছেন এবং দেখিয়েছেন কমিউনিষ্ট পার্টির মত কোন বিদেশী অনুকরণে গঠিত দলের আদৌ প্রয়োজন নেই।

শ্রেণী সংগ্রাম সম্পর্কিত বিবেকানন্দের মৌলিক দার্শনিক চিন্তাধারার সত্যতার প্রমাণ মেলে পিতিরিম সোরোকিনের আবিষ্কৃত Theory of Emanent Change-এ। শুধু তাই নয়, বর্তমান যুগের আরো অনেক্য সমাজবিজ্ঞানী ও দার্শনিক প্রগতি সম্বন্ধে এই একই ধারণায় পৌঁছেছেন। এর মধ্যে রয়েছেন অ্যাল্ভা ভেরেরা, ফ্রেজার, ডুরখীম, বার্ট্রণ্ড রাসেলের মত চিন্তাবিদেরা।

বর্তমান বিশ্বেও আমরা দেখতে পাচ্ছি সর্বহারার একনায়কত্বের তত্ত্ব দুই ভাবে ব্যর্থ হয়ে গেছে। প্রথমতঃ সর্বহারা শ্রেণীর মধ্যে মার্ক্স শ্রমবদ্ধ শ্রমিক শ্রেণীকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। কৃষক শ্রেণীকে শত্রুপোষী শ্রেণী হিসেবে দেখে তিনি তাদের মধ্যে বিপ্লবী শক্তির অভাব দেখেছিলেন। বাস্তবক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঠিক উল্টে গেল। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে, যেখানে শিল্প বিপ্লবের ফলে সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে সেখানে আদৌই বিপ্লব এল না, কৃষক শ্রেণীর নেতৃত্বেই এশিয়ায় বিপ্লবকে চীন দেশে স্থাপন করতে হয়েছে, রাশিয়াও বিপ্লবের সময়ে মূলতঃ কৃষি নির্ভর আধাসামন্ততান্ত্রিক একটি দেশ ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

দ্বিতীয়তঃ সর্বহারার একনায়কত্ব এবং বিপ্লব সম্বন্ধেই আজকে বিশ্বের তিনটি বৃহৎ প্রাচীন কমিউনিষ্ট পার্টি তাদের বিশ্বাস ফিরিয়ে নিয়েছে অথবা সংশয় প্রকাশ করেছে। এই দুটি কমিউনিষ্ট পার্টি হল ফরাসী এবং ইটালিয়ান কমিউনিষ্ট পার্টি, পর্তুগীজ কমিউনিষ্ট পার্টি।

অপরদিকে দেখা যাচ্ছে শ্রেণী সংগ্রামের ভিত্তিতে গঠিত পার্টিগুলিও আজকে বাস্তব প্রয়োজনে সব দেশেই জাতীয় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে চাইছে, অর্থাৎ জাতীয়তার সঙ্গে সমন্বয় গড়ে তুলতে চাইছে। এখন প্রশ্ন এই বাস্তব প্রয়োজনটা কি? প্রয়োজনটা খুব বড় ভাবে না বলে উপায় নেই সেটা হ'ল টিকে থাকার। বস্তুতঃ সুভাষবাদী লাইন গ্রহণ না করলে ভারতবর্ষে কোন বামপন্থী দলের দীর্ঘস্থায়ী ভাবে টিকে থাকা সম্ভব নয়। কাজেই মার্ক্সবাদ লেনিনবাদ বা অন্য যে কোন মতবাদের কথাই বলা হোক না কেন এদেশে সুভাষবাদী লাইন না নিলে কোন দলের পক্ষেই জনগণের মুক্তির সংগ্রামের পথ প্রদর্শক আর ভাঙিয়ার হয়ে ওঠা সম্ভব নয়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে শুধুমাত্র তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর এবং দৃঢ়তাই নয়, প্রায়োগিক ক্ষেত্রেও সুভাষবাদী লাইনই শ্রেণী সংগ্রাম সম্পর্কে সবচেয়ে বাস্তব এবং ফলপ্রসূ।

আমাদের পরবর্তী আলোচ্য বিষয় সুভাষবাদী শিক্ষানীতি।

সুভাষবাদী শিক্ষানীতি

শিক্ষা সম্পর্কে ভারতীয় আর পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য প্রায় পরস্পর বিরোধে বরাবরই বর্তমান রয়েছে। ইউরোপীয় দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষার্থী হল অলিখিত শ্লেটের মত। অথবা বলা যায় একতাল নরম মাটির মত। শিক্ষাই সেই নরম মাটিকে সুনির্দিষ্ট রূপ দেয়, অথবা শূন্য শ্লেটের উপর বিচিত্র চিত্রের প্রকাশ ঘটায়। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী ঠিক এর বিপরীত কথাই বলে। নিজেকে জানাই, ভারতীয় মতে শিক্ষার শেষ কথা, এবং সেই দিক

থেকে দেখলে শিক্ষার্থী নিজেই সমস্ত জ্ঞানের আধার প্রয়োজন শুধু সেই জ্ঞান বা বোধের উদ্বোধন। শিক্ষক বা গুরুর দায়িত্ব ভারতীয় মতে উদ্বোধকের।

নেতাজীর সমস্ত চিন্তাধারার ভিত্তি ভারতীয় জীবন, মনন, ধারা বাহিকতা। একই সঙ্গে নেতাজী সমন্বয়বাদী। আর দার্শনিক নিয়ম অনুযায়ী সমন্বয় সব সময়তেই সাধিত হয় উচ্চতর পর্যায়ে। নেতাজী দেখেছেন এই দুই আপাতঃ পরস্পর বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী জীবনের সমগ্র ব্যাপ্তির দুটি দিকের বাস্তব তথ্যায়ন। পারত্রিক জ্ঞান তথা আত্মিক বিকাশের জন্য ভারতীয় শিক্ষাতত্ত্ব প্রয়োজন অপর দিকে ব্যবহারিক জ্ঞান লাভের জন্যে এবং সেই সব জ্ঞান প্রয়োগের জন্যে দরকার দক্ষতা লাভের শিক্ষা। প্রথানিত ভাবে পাশ্চাত্য জগত এই শিক্ষাদানের সকল পদ্ধতি অনুসরণ করেছে। তাই যে কোন মানুষের বেঁচে থাকা এবং বিকাশ লাভ করার জন্যে দরকার এক সামগ্রিক শিক্ষার আর জীবন বোধের। অন্য কথায় বলা চলে শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর প্রতিভার বা বৈশিষ্ট্যের স্ফুরণ ঘটানো এবং জীবিকালাভের জন্য দক্ষতা দান করা। প্রকৃতি এবং মানব সমাজের মধ্যে, পরিবেশ এবং মানুষের মধ্যে, মানুষের পারস্পরিক দ্বন্দ্বে, এবং ব্যক্তি মানুষের নিজের ভিতরকার দ্বন্দ্বে সঠিক পথে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা অর্জনের প্রণালীর নামই শিক্ষা। উচ্চতর পর্যায়ে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে কারিগরী এবং আত্মিক ক্ষেত্রে কুশলতা ও উদ্ভাবন শক্তির বিকাশ ঘটানোর মাধ্যমকেই শিক্ষা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন নেতাজী। আর এই শিক্ষাব্যবস্থারই নাম তিনি দিয়েছেন 'জাতীয় শিক্ষা'। নেতাজী দৃঢ়তার সঙ্গে আমাদের দেখিয়েছেন যে সমস্ত সংস্কৃতিরই একটা জাতীয় বৈশিষ্ট্য এবং তার পিছনে দীর্ঘদিনের জাতীয় ঐতিহ্য থাকে। শিক্ষারও সেই একই সঙ্গে জাতীয় ভিত্তি থাকতে বাধ্য। এবং এই কারণেই কোন সময়তেই কোন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার অন্ধ অনুকরণে অন্য কোন দেশের শিক্ষা কাঠামো তৈরী হতে পারে না। জোর করে সে রকম কিছু করা হলে তার ফল অত্যন্ত মারাত্মক হতে বাধ্য। আমাদের দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক নৈরাজ্য এবং হতাশা এর জলন্ত উদাহরণ। অর্থাৎ জাতীয় শিক্ষানীতি সব সময়তেই হবে জাতীয় স্বার্থ, প্রয়োজন, ভৌগোলিক অবস্থান, ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা ও দায়িত্ব, সাধারণ প্রকৃতি ও মনস্তত্ত্ব ভিত্তিক এবং জাতীয় পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য সমন্বিত।

জাতীয় শিক্ষানীতি খুব সুপরিকল্পিত উপায়ে কার্যকর করতে হবে। আমাদের দেশে শিক্ষার অঙ্গ বিচ্ছিন্ন চাপিয়ে দেবার ফলে সুষ্ঠু পরিকল্পনার একান্ত অভাব। (শিক্ষা সমস্যার উপর এই পত্রিকার ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩০ সংখ্যায় শ্রীসুবোধ মজুমদারের নিবন্ধ দ্রষ্টব্য)

জাতীয় শিক্ষার তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নেতাজী বলেছিলেন প্রথমতঃ জাতীয় শিক্ষাকে হতে হবে চরিত্র গঠনের উপযোগী, এছাড়া "আমাদের দেশে যেরূপ দারিদ্র, সেই দারিদ্র যাহাতে দূর করা যায় সেই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তৃতীয়তঃ—আমাদের দেশের ছাত্রদের যেরূপ শারীরিক-মানসিক অবস্থা সেই শারীরিক-মানসিক অবস্থার উপযোগী শিক্ষার প্রণালীই আমাদিগকে উদ্ভাবন করিতে হইবে।"

('জাতীয় শিক্ষার কথা,' উদ্বোধনা, ১৩৩০ বৈশাখ, পাক্ষিক বসুমতী ওয়ার্ল্ড ব্লক থেকে সংগৃহীত) [চলবে]

ভ্রম সংশোধন

সূচীপত্রে লেখকের নাম শ্রীপার্থ স্থলে
ডঃ ভূপেন দত্ত হইবে।

[৪ পাতার পর]

কিন্তু আবার বলি, বাংলায় বিপ্লববাদীদের যতই দুর্ভাগ্য হোক না কেন, এই যে স্বাধীনতাবাদ-তরঙ্গ বাংলায় এসেছে তার প্রভাব বাংলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এ কাজ বাঙালী জাতির রক্ত বাংলের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। বিপ্লবীদের কাজ ভারতীয় ইতিহাস থেকে বাদ দেওয়া যায় না। বরং যে সংস্কার গভর্নমেন্টের কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে তা বিপ্লবীদের কাজের গৌণ ফল। (১) এ কথা অস্বীকার করা ইতিহাসকে অস্বীকার করা হবে। ভারতীয় বিপ্লবী যুবক ভারতে এক নতুন যুগ এনেছে, ভারতীয় রাজনীতিতে এক নতুন পন্থা আবিষ্কার করেছে, এক নতুন আলো এনেছে। ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের খুব বেশী দৌড় ইণ্ডিয়া অফিসের দ্বারে অনুনয় বিনয় করা ও লাথি খাওয়া, আর বৈপ্লবিক যুবকেরা পৃথিবীর অনেক পরাক্রান্ত গভর্নমেন্টের সঙ্গে বন্ধুভাবে কাজ করেছে ও করছে।

এই জায়গায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখযোগ্য যে বাংলার বিপ্লবী ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বিপ্লবীদের চরিত্র এক ছাঁচে ঢালা। বাংলার উপর সমালোচনা নিখিল ভারতীয় বিপ্লবীদের উপরেও প্রযুক্ত হয়। বাংলার কিশোর বয়স্ক যুবক যে তেজে তেজীয়ান হয়ে অদ্ভুতকর্মা হয়েছে, অন্যান্য প্রদেশের যুবকদের মধ্যেও সেইরকম তেজস্বিতা প্রকাশ পেয়েছে। এইখানে দুই একজনের নাম উল্লেখযোগ্য —যথা, আমেরিকার গদর পার্টির কর্তার সিং, সোহন সিং ও পিংলে। প্রথমোক্তটির ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে লাহোরে ফাঁসী হয় ও শেষোক্ত দুটির বর্মায় ফাঁসী হয়। (২) তারপরে বার্লিন থেকে পাঞ্জাবে প্রেরিত বসন্ত সিং, বেদারনাথ ও করসাস্প (পার্সি যুবক); এঁদের পাঞ্জাবে ইংরেজ গুলি করে মেরেছে। দেশে আরো অনেক যুবক অতি তেজস্বিতার সঙ্গে স্বাধীনতার নামে প্রাণ দিয়েছেন। যে যে জতীন্দ্র নাথ বসু, কানাইলাল দত্ত, সুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী ইত্যাদি দেখিয়েছিলেন, কিশোর বয়স্ক কর্তার সিং, সোহন সিং ও বসন্ত সিং ইত্যাদিও তাই-ই দেখিয়েছিলেন। মনের দিকের জোর সর্বত্রই সমান। বরং বিগত যুদ্ধের সময় বাইরে বাঙালীরই বদনাম হয়েছে। পাঞ্জাবী বিপ্লবীরা বলেন যে, যুদ্ধের সময় বিপ্লবোদ্যমের চেষ্টায় পাঞ্জাবীরা প্রাণ দিয়েছে, আর বাঙালীদের মধ্যে কেউ কেউ টাকা চুরি করেছে! কথাটা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের দোষ ছেড়ে দিয়ে সমষ্টির গুণ গ্রহণ করলে গুণের দিকেই পাল্লা ভারি হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলায় তাঁর 'ঘরে বাইরে' নামক বইতে দুজন বিপ্লবীর চরিত্র এঁকেছেন—সন্দীপ ও বালক অমূল্য। সন্দীপ বক্তা ও স্বদেশ সেবক দলের বড় এক পাণ্ডা। তার মুখে ত্যাগের গান ও অন্তরে ভোগের ইচ্ছে। কিন্তু আমি অন্ততঃ এরকম বিপ্লবী বাঙলার ভিতর দেখিনি। "পাকা হরিতকী" খেয়ে কবিরাজি করে দেশোদ্ধারের কর্মের নামে লোকের মনে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস উৎপাদন করেন অথচ অন্তরে ভোগ লালসা বিদ্যমান এরকম বিপ্লবী বাংলায় আমি দেখিনি। বাংলায় একবার অরবিন্দ দ্বারা 'ভবানী মন্দির' স্থাপন করে সাধুগিরি করে বিপ্লববাদ প্রচার করার কথা উঠেছিল বটে: (৩) কিন্তু তা বেশীদূর অগ্রসর হয়নি। তবে বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির প্রথমোদ্যমে জনকতক যুবক গেরুয়া পরে লোক ভজাবার জন্য এদিক ওদিক গিয়েছিল বটে—কিন্তু তাঁরা সন্দীপের চরিত্রের লোক ছিলেন না। অন্যদিকে অমূল্যের চরিত্রে যথার্থ-ই বঙ্গের কিশোর বয়স্ক বিপ্লবীর চরিত্র ফুটে উঠেছে। সন্দীপ অন্য কোন পন্থাবলম্বী হতে পারে কিন্তু বিপ্লবী নয়। তার চরিত্রে বিপ্লবীর চরিত্র অঙ্কিত হয়নি। আমি যতদূর জানি বিপ্লবীরা মকট বৈরাগ্যের ভেকধারী নন। তাঁরা স্বাভাবিক জীবন অবলম্বন করেন। তবে অনেকেই জীবনের আদর্শ অতি উঁচুতে ধরেছেন। শুনেছি, পূর্বে চরিত্রের এই মাপকাঠি নিয়ে দলাদলিও ছিল। একদলে নতুন লোককে সভ্য হবার সময়ে কঠোর নৈতিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হত না অর্থাৎ এ দলে সব রকম চরিত্রের লোককে গ্রহণ করা হত: কিন্তু অন্য দলের বিপ্লবী চরিত্রের উপর কঠোর দৃষ্টি ছিল।

বাংলায় বিপ্লবীদের দ্বারা যে বন্যা এসেছিল তাতে উপযুক্ত নেতার অভাবে আজ ভাঁটা পড়েছে। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতী বা অ'চার্য

কেশবচন্দ্র সেনের মত মহাপুরুষ অবতীর্ণ হন নি বলেই জাতীয় উচ্ছ্বাসের বন্যা যারা কোন স্থায়ী জাতীয় কর্ম সংস্থাপন করা যেতে পারেনি ; শক্তির পূর্ণ ব্যবহার বাংলায় হতে পারেনি। বাংলার বা ভারতের বিপ্লববাদে কোন অতি মানবের উদয় হয়নি, এটাই তার দুর্ভাগ্য।

আলিপুরের মোকদ্দমার পর বিপ্লববাদের ইতিহাসের তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত হয়। এই সময়ে আমি দেশত্যাগী হই। আমার সঙ্গে দেশের আর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন সম্পর্ক ছিল না। সুদূর আমেরিকাতে সংবাদ পত্র ছাড়া আর কোন ভাবে বৈপ্লবিক সংবাদ পাওয়া যেত না। কিন্তু ১৯১১ সালে শ্রীযুক্ত তারকনাথ দাস আমাকে কানিফোর্নিয়া থেকে লিখলেন যে, দেশ থেকে অমুক অমুক এসেছেন। তিনি বলেন, দেশে খুব ভাল কাজ হচ্ছে। পরে আর একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হয়। (৩) তাঁর খবর এই যে, দলের পুরোন লোকেরা সকলেই কাজ করছেন। গ্রামে গ্রামে সমিতি স্থাপন করা হচ্ছে। কর্মক্ষেত্র অতি বিশেষভাবে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। বাঙালীর চরিত্রের কিছু উন্নতি হয়েছে কিনা আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে বেশী কথাটির ও হুজুগে বাঙালী আজ মুখ বন্ধ করে কাজ করছে ; এর চেয়ে আর আশ্চর্য কি আছে? এঁর কাছ থেকে দলাদলির খবর পাইনি। সে খবর যখন পেয়েছিলাম তখন সব ফুরিয়ে গিয়েছে। তারপরে জগৎব্যাপী যুদ্ধ বেধে ওঠে। এই সঙ্গে দেশ ও বিদেশের ভারতীয় বিপ্লবীরাও সাড়া দিয়ে উঠলেন। তাঁরাও জাতীয় বিপ্লবের জন্যে যে সুযোগের অনুসন্ধান করছিলেন তা পেলেন। এই সময়ে বাংলার বিপ্লবী জীবনে এক নতুন বন্যা উপস্থিত হয়, তাতে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট টলটলায়মান হয়েছিল। [চলবে]

শাস্ত্রে অসাধারণ বুৎপত্তি সম্পন্ন—বিখ্যাত 'ফলিতজ্যোতিষ' গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীহরিহর জ্যোতিশাস্ত্রী

বি, এ, এল, এল. বি (কলি) এ, সি, আই, আই (লণ্ডন)

প্রতিদিন সকাল ৮টা হইতে ১১টা এবং মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার ব্যতীত অন্যদিন বৈকাল ৫টা হতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত ঠিকানায় সর্ব্বপ্রকার জ্যোতিষী কার্য্য করেন।

কোষ্ঠী বিচারের পারিশ্রমিক ন্যূনপক্ষে ২০ টাকা।

চেম্বারের ঠিকানা :— পি-৩৪ কাঞ্চনগো পার্ক, গড়িয়া, ২৪ পরগণা
৪ নং বাদরুট, বৈকবঘাটা ষ্টপ।

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Name	Address	Amount per month	Date
24-Parganas			
Acharya Manindra Chandra	361/1 Ashokenagar 24-Pgs-	200	1-4-76
Chowdhury Shri Amiya Nihar	M-124 Patna Road P. O. Nimta	200	31-3-76
Midnapore Dist.			
Botal Latu	Chaukhola, P. O. Sutahata	200	15-8-72
Das Ananta Kumar	P. O. Thakurnagar, P. S. Khejuri	200	14-11-74
Das Aswini Kumar	Haldia, P. O. Basanchak	200	6-4-74
Das Dhirendra Nath	Shyamchak, P. O. Charbarh	200	2-4-74
Das Sanat Kumar	Hariballavpur, P. O. Deulpota	200	20-6-74
Das Sourindra Nath	P. O. Lakhya, Mahisadal	200	15-8-72
Gharti Smt. Parlaji Bala, W/O. Kalachand Barjalalpur, P.O.Kalora		100	15-8-72
Ghosh Sibendra Nath	Barbarisha, P. O. Kalaghat	200	1.4.74
Ghorai Jiban Krishna	Jalda, P. O. Bhimeswari Bazar	200	22-1-75
Jana Haripada	Deulpota, P. O. Bar Basudebpur	200	15-8.62
Jana Lakshman Chandra	P. O. Srikantha, Mayna	200	27-2-74
Mohanty Ram Chandra	Pratapdighi, p. S. Potaspur	200	6-12-72
Maity Hari shkesh	Bardhabya Ghata, P.O. Khanjan Chak	200	5-4-74
Maity Nandagopal	P. O. Dumurdari, P.S. Bhagwanpur	200	15-8-72
Maity Smt. Sailabala Wd /O. Late Dadhi Mohan Mity	P.O. Contai	200	13-2-74
Pramanik Smt. Khakibala Wd./Late Naba Kumar	Hadia P.O. Basanchak	100	5-4-74

Regd. No. R. N .24511/71 | Biplabi Bangla | Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা | ষাণ্মাসিক ৮—৮.০০ টাকা | প্রতি সংখ্যা—৩০ পয়সা।

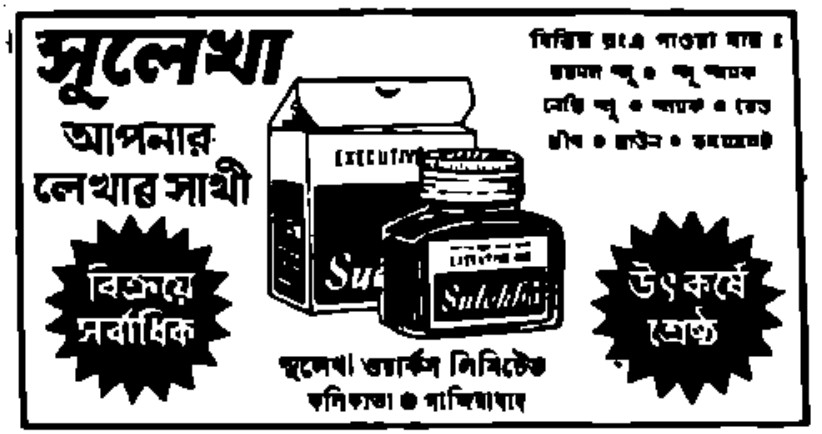

— সম্পাদক মণ্ডলী —
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) · শ্রীপরিমল মজুমদার, শ্রীপুলক চ্যাটার্জী, শ্রীবারীণ রায়।
সম্পাদক—শ্রীনাভি পদম রায়চৌধুরী ও যুগ-সম্পাদক—শ্রীমদন ধর।
প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅমিল সেনগুপ্ত।
বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৪নং বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩
মুদ্রণে :—প্রিন্টিং পাবলিসিটী, ১১৭ বি, কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯